তাসাউফ সমগ্র

অনুবাদক ও সংকলক
কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

তাসাউফ সমগ্র

অনুবাদক ও সংকলক
কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

সনৃজরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

তাসাউফ সমগ্র

অনুবাদক ও সংকলক
কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

সম্পাদনায়
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী আশরাফী

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত
© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে জান্নাতুল ফিরদাউস লিসা

প্রকাশকাল
১৩ ডিসেম্বর ২০১৬, ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ সাল।

প্রকাশনায় :
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা- ১২০৫, মোবাইল : ০১৯২৫-১৩২০৩১
৮১, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১
E-mail : Sanjarypublication@gmail.com

পরিবেশনায় : সনজরী বুক ডিপো

মূল্য : ২৩০ [দুইশত ত্রিশ] টাকা মাত্র

Tasauf Somogro, Translated & Collected By: Kazi Saifuddin Hossain, Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 230/=

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ﴾

প্রকাশকের কথা

হযরত ইমাম রেফায়ী কবীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন– হে প্রিয়! তুমি তোমার অন্তরকে পরিস্কার করো, আবর্জনা সাফ করো, অবস্থা পাকপবিত্র করো, পড়শীর হক আদায় করো, রাত্রিবেলা নামায আদায় করো, দিনের বেলা রোযা পালন করো। এটাই হচ্ছে তোমাদের তাসাউফ।

আর সুফীদের তাসাউফ হচ্ছে, বস্তুর চাহিদা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা। প্রবৃত্তির বেষ্টনী থেকে বের হয়ে যাওয়া, শরীয়তের সমস্ত হুকুম-আহকাম (ফরয সুন্নাত এবং মুস্তাহাব)-এর উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করা, মারিফাতে পরিপূর্ণতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত পরিতৃপ্ত না হওয়া (দমে না যাওয়া)। অতপর তিনি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করলেন–

لَيْسَ التَّصَوُّفُ بِالْخِرْقِ ◊ مَنْ قَالَ هَذَا مَا صَدَقَ

اَنَّ التَّصَوُّفَ يَافَتَى ◊ خَرَقَ يَمَازَ جَهَا قَلَقَ

হে যুবক! সূফীদের লেবাস পরিধান করা নাম তাসাউফ নয়, যে এ কথা বলে তার কথা সত্য নয়।
হে যুবক! তাসাউফ হচ্ছে, অস্থীর হয়ে এশকের আগুনে দগ্ধ হওয়া।

যারা সাধনা করে মারিফাতে ইলাহীর সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে চায়, তারা ফানাফিল্লাহ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। বস্তুতঃ এটাই হলো সূফীদের তাসাউফ।

তাসাউফের চার স্তর। যথা– (ক) ফানা ফিশ শাইখ; (খ) তাসহীহুল হাল; (গ) তামাককুন ফী মারাতিবিল আহওয়াল এবং (ঘ) ইস্তেগরাক।

ফানা ফিশ শাইখের তাৎপর্য এই যে, উপযুক্ত শাইখের হাল অবস্থার মধ্যে নিজকে নিমগ্ন ও ফানা করে নিজের পবিত্র অবস্থাকে মিটিয়ে, নিজের ভিতর শাইখের অবস্থা সৃষ্টি করা। আশার তাড়নাকে নিশ্চিহ্ন করে শাইখের বাস্তব চরিত্র ও সততাকে নিজের ভিতর ফুটিয়ে তোলা। আর তা শরীয়ত অসমর্থিত গুণাবলী বর্জন ও শাইখের সমর্থিত গুণাবলী নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

তাসহীহুল হাল বা অবস্থার পরিশুদ্ধির তাৎপর্য হচ্ছে– শাইখের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ অবস্থার প্রতি সঠিক দৃষ্টি আরোপ করে সে অনুপাতে পরম শ্রদ্ধাভক্তির সাথে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করতঃ স্বীয় অবস্থার পরিশুদ্ধি ঘটানো। যাতে শরীয়তের বিধানে তার অবস্থার স্বীকৃতি পাওয়া যায় এবং তার অবস্থা যাতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থার বাস্তব নমুনা হয়।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থার বিভিন্ন স্তর সমূহের অনুকূলে পবিত্র কুরআনের অনুকরণে নিজকে স্থাপিত করা। পবিত্র কুরআনের অনুকরণের অর্থ হচ্ছে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ চরিত্রের অনুসরণ করা। কেননা, পবিত্র কুরআন মূলতঃ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ চরিত্রই বটে।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কঠোর সাধনার অনুকরণে যিকরুল্লাহর সাহায্যে মহান আল্লাহর জাতের ভিতর নিজকে ডুবিয়ে দেয়া এবং ফানাফিল্লাহর স্তরে উন্নিত হয়ে পরিতৃপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর পবিত্র দরবারে নিমগ্ন থাকা হচ্চে ইস্তেগরাক।

সূফীদের আত্মার খোরাক হিসেবে 'তাসাউফ সমগ্র' নামক গুরুত্বপূর্ণ এ পুস্তকটি অনুবাদ ও সংকলন করেন শ্রদ্ধেয় জনাব কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন। তাঁর সাথে যারা উক্ত পুস্তক প্রকাশে সহযোগীতা করেছেন, বিশেষকরে মাওলানা নেজাম উদ্দীন, মাওলানা আবদুল মজিদ, মাওলানা মুহাম্মদ রুবাইয়াত বিন মূসা এবং মাওলানা মুহাম্মদ খাইরুল্লাহ'র প্রতি শুকরিয়া আদায় করছি। কোথাও ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে বিজ্ঞ পাঠক আমাদেরকে অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধনে সচেষ্ট থাকব, ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরি পাবলিকেশন

সূচীপত্র

■ সূচনা/ ০১
- ♦ ইসলামে মতপার্থক্য সমাধানের উপায়/ ০১
- ♦ তাসাউফ একটি পারিভাষিক শব্দ/ ০২
- ♦ কুরআন ও হাদীসে নিহিত জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা/ ০৫
- ♦ আল্লাহ পাক কর্তৃক 'তাযকিয়্যাহ' (পরিশুদ্ধি)-এর কথা উল্লেখ/ ০৬
- ♦ এলম আত্ তাওহীদ (আকীদা-বিশ্বাসসম্পর্কিত জ্ঞান)/ ১০
- ♦ আহাদীসের শ্রেণীবিন্যাস/ ১৩
- ♦ হাদীসের আলেম-উলেমা (মোহাদ্দেসীন)/ ১৬

■ [এক] : ছয়টি প্রশ্নের উত্তর/ ২১

●প্রথম প্রশ্নের উত্তর/ ২১
- ♦ তাসাউফ = তাযকিয়্যাত আন্ নফস্/ ২২
- ♦ রাসূলুল্লাহ ﷺ'র পরবর্তী যুগে ইসলামী বিদ্যা চালুর প্রয়োজনীয়তা/ ২৩
- ♦ 'তাসাউফ' শব্দের ধাতু/ ২৫
- ♦ রাসূলুল্লাহ ﷺ'র অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ/ ২৬
- ♦ 'তাসাউফ' শব্দটি সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া মন্তব্য/ ৩০
- ♦ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দিল ওয়াহ্হাব-এর 'তাসাউফ' সম্পর্কে ভাষ্য/ ৩২

● দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর/ ৩৩
- ♦ আল-কুরআনে আলোকে 'তাসাউফ'/ ৩৪
- ♦ পবিত্র কুরআনে ঈমানদারদেরকে 'সাদেকীন'দের সাথী হওয়ার আদেশ/ ৩৫
- ♦ আল্লাহ পাকের 'মোহসেনীন'-কে সঠিক পথপ্রদর্শনের ওয়াদা/ ৩৭
- ♦ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক উলামাবৃন্দের অন্তরের কথা উল্লেখ/ ৩৮
- ♦ আল্লাহ তাঁর নৈকট্য অন্বেষণের জন্যে মাধ্যম তালাশের করার নির্দেশ/ ৩৮
- ♦ আল্লাহ তা'আলা 'তাযকিয়্যাত আন্ নাফস্' উল্লেখ করেন/ ৩৯
- ♦ 'তাযকিয়্যা' শব্দের অভিধানিক অর্থ/ ৪২
- ♦ 'এহসান' পূর্ণতাপ্রাপ্ত চারিত্রিক অবস্থাসম্পর্কিত কুরআনের আয়াত/ ৪৩
- ♦ 'এহসান' ও তা হতে উৎপন্ন শব্দাবলীর আভিধানিক অর্থ/ ৪৪

● তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর : 'তাসাউফ' সম্পর্কে হাদীসের দলিলগুলো কী কী?/ ৪৬
- ♦ উম্মূল আহাদীস: হাদীস-এ-জিবরীল/ ৪৭
- ♦ দ্বীন-ইসলামের তৃতীয় অংশ 'এহসান' (চারিত্রিক পূর্ণতা)/ ৫১
- ♦ 'এহসান' ও 'তাযকিয়্যা'-বিষয়ক বিদ্যাশাস্ত্র/ ৫৩
- ♦ 'শরীয়াহ' ও 'হাকীকত'-এর পারস্পরিক সম্পর্ক/ ৫৪
- ♦ মহান ইমামবৃন্দ 'তাসাউফ' সম্পর্কে যা বলেছেন/ ৫৫
- ♦ চার মযহাব প্রত্যাখ্যানকারীর ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়ার অভিমত/ ৫৬

● চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রশ্নগুলোর উত্তর/ ৫৭

■ **[দুই] : সুন্নাহ-ভিত্তিক ইসলামে তাসাউফের স্থান/ ৫৯**
১. আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা/ ৭০
২. করুণা/ ৭১
৩. পারস্পরিক ভালোবাসা/ ৭১
৪. নামাযে একাগ্রতা/ ৭১
৫. নবী-প্রেম/ ৭২
১. আল্লাহ ভিন্ন কাউকে ভয় করা/ ৭২
২/ নৈরাশ্য/ ৭৩
৩. দম্ভ/ ৭৩
৪. ঈর্ষা/ ৭৩
৫. এবাদত-বন্দেগীর প্রদর্শনী/ ৭৪

■ **[তিন] : তাসাউফের অর্থ ও তাৎপর্য/ ৯২**
- ♦ 'সূফী' সংজ্ঞাটির উৎপত্তি/ ৯৩
- ♦ তাসাউফের উৎসসমূহ/ ৯৪
- ♦ সূফীবাদ তিন-ধারা বিশিষ্ট প্রক্রিয়া/ ৯৭
- ♦ শরীয়ত ও তাসাউফ/ ৯৮
- ♦ চিশ্তীয়া তরীকা/ ৯৮
- ♦ উপসংহার/ ৯৯

■ [চার] : তাসাউফ (সূফীতত্ত্ব)/ ১০০

■ [পাঁচ] :তাসাউফ অর্জন ও বাইয়া'ত গ্রহণ/ ১১০
- ♦ বাই'য়াত/ ১১৯

■ [ছয়] : তাযকিয়ায়ে নফস্ (প্রবৃত্তি/ষড়রিপুর পরিশুদ্ধি): সূফী প্রেরণার একটি মৌলনীতি/ ১২৭

■ [সাত] : সূফীবাদের উৎস/ ১৩২

■ [আট] : মওলানা রূমী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর দৃষ্টিতে প্রকৃত সূফী ও ভণ্ডের পার্থক্য/ ১৩৭

■ [নয়] : কামেল পীরের কাছে বায়া'ত হবার আবশ্যকতা/ ১৩৯
  ♦ কামেল পীরের বৈশিষ্ট্য/ ১৪৩

■ [দশ] : বেলায়াত (ওলীত্ব) ও কুরবাত (নৈকট্য)/ ১৪৫
  ♦ ওলী-এর অর্থ/ ১৪৫
  ♦ বেলায়াত অর্জনে শরীয়তের প্রাধান্য/ ১৪৯
  ♦ আউলিয়ার প্রতি ভালোবাসা/ ১৫১

■ [এগার] : পীরের প্রতি মুরীদের পালিত আদব/ ১৫৬
  ♦ আশ্ শায়খু ফী কওমিহী কান্ নবীয়্যে ফী উম্মাতিহী/ ১৫৭

■ [বার] : শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত/ ১৬৯
  ♦ অনুবাদকের আ'রয/ ১৬৯
  ♦ শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত/ ১৭০

■ প্রমাণপঞ্জী/ ১৭৫

সূচনা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রিয় দ্বীনী ভাই ও বোনেরা,
আমরা আপনাদের ইসলামী অভিবাদনসূচক 'সালাম' জানাই। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান,

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

অর্থাৎ, 'এবং যখন তোমাদেরকে কেউ কোনো বচন দ্বারা সালাম করে, তখন তোমরা তার চেয়েও ভালো কোনো বচন জবাবে বলো, কিংবা অনুরূপ-ই বলো। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়/বস্তুর হিসেব গ্রহণকারী।'[১] (মুফতী আহমদ এয়ার খান সাহেবের 'তাফসীরে নূরুল এরফান')

অতএব, আমরা আপনাদেরকে 'তাহইয়্যাত আল-ইসলাম'স্বরূপ 'আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' দ্বারা অভিবাদন জানাই, আর আশা করি আপনারাও আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম বা অনুরূপ সম্ভাষণ জানাবেন; অধিকন্তু, কোনো রকম বৈরিভাব বা অভিযোগ মনে রাখবেন না। কেননা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইন্টারনেটে সীমাছাড়া অন্যায়ের ঘটনা ঘটছে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। আর এই অবিচার একতরফা ঘটছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যা-ই বলি না কেন, কিছু লোক আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেই চলেছে এবং তারা যা বলছে তা-ই গৃহীত বলে ধরে নেয়া হচ্ছে।

ইসলামে মতপার্থক্য সমাধানের উপায়

আমরা নিজেদের মনগড়া মতামত ব্যক্ত করছি না, বরং অসংখ্য, অসংখ্য মুসলমান যে পথ ও মত গ্রহণ করেছেন, তা-ই প্রকাশ করছি। এতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখতেলাফ তথা মতপার্থক্যের সূত্রপাত হয়েছে। কখনো কখনো ইসলাম ধর্মে এখতেলাফ হতে পারে, আর এটি 'এজতেহাদ'গত মতপার্থক্যের কারণেই হতে পারে। এই কারণেই

---

[১]. আল কুর'আন : সূরা নিসা, ৪:৮৬।

কতিপয় উলামার মতে, বাবুল এজতেহাদ তথা এজতেহাদের দরজা এখনো উন্মুক্ত। বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এখন নয়; কিন্তু যারা এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন, তাদের কাছে তা উন্মুক্ত এ কারণে যে চার মযহাবের ইমামবৃন্দের পরবর্তীকালে আগত ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির গভীর জ্ঞানী আলেমবৃন্দ নতুন এজতেহাদ প্রয়োগ করতে পারবেন।[২]

অতএব, মুসলমানবৃন্দ যখন পরস্পর ভিন্নমত পোষণ করেন, তখন একে অপরকে যেন দোষারোপ না করেন। কেননা, তা ইসলামী আদব বা শিষ্টাচারের খেলাফ হবে। তাদের জন্যে যে কাজটি যথাযথ হবে তা হলো, অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ না করে আলোচ্য বিষয়ে উভয় মতের প্রতিনিধিত্বকারী আলেমমণ্ডলী কী লেখেছেন, তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করা। তাই আমরা বলি, 'ইসলামী উলেমাবৃন্দের অনেকে বিগত ১৪০০ বছরের ইসলামী ইতিহাসে কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা যেভাবে করেছেন, তা কেউ না জেনে থাকলে সেই বিষয়গুলো জানতে এবং ইসলামী উলামাদের ব্যাখ্যাকৃত এতদসংক্রান্ত অন্যান্য সকল দৃষ্টিভঙ্গি ও অত্যাবশ্যক নীতিমালার বিবেচনামূলক স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে তার অবশ্যই বিদ্যমান বইপত্র পড়া উচিত।'

আমরা আজ যে বিষয়টি ইন্টারনেটে প্রকাশ করছি, তা সকল উলামা-এ-কেরাম-ই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এতে তাঁরা মহাজ্ঞানের ভাণ্ডার আহরণ করেছিলেন এবং এ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল ছিলেন যে এর শিকড় দ্বীন ইসলামের গভীরেই প্রোথিত রয়েছে। উপরন্তু, তাঁরা মতামত ব্যক্ত করেছিলেন যে প্রকৃত তাসাউফ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাহ ও শরীয়তানুগ বিষয়, কেননা তা সুন্নাহ ও শরীয়তের অন্তস্তল হতেই নিঃসৃত।

তাসাউফ একটি পারিভাষিক শব্দ

তাসাউফ হলো একটি পারিভাষিক শব্দ, যা প্রসিদ্ধ হাদীসে জিবরীল-এ উল্লেখিত 'এহসান' অবস্থাকে ব্যক্ত করে এবং পবিত্র কুরআন মজীদে উল্লেখিত 'তাযকিয়্যাত আন্ নফস্' তথা আত্মপরিশুদ্ধির প্রক্রিয়াকেও বর্ণনা করে। এটি দ্বীন ইসলামে গ্রহণযোগ্য, যতোক্ষণ পর্যন্ত তাতে 'শাওওয়াযা' তথা কুসংস্কার না থাকে। আমরা বহুবার বলেছি, আমরা

[২]. এটি চার মযহাবের অন্তর্গত হয়েই করতে হবে - অনুবাদক।

কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না, তার অনুসরণ-ও করি না। আমরা তাযকিয়্যাত আন্ নফস্ ও অন্তর পরিশুদ্ধিমূলক এহসান অবস্থাকে গ্রহণ করি, কেননা তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ'র এবং কুরআনী শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা তাসাউফের সংজ্ঞা মেনে চলি, যা ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়্যেম আল-জাওযিয়্যা ও ইবনে কাসীর এবং ইসলামী শরীয়তের চার মযহাবের অন্যান্য সকল উলেমাবৃন্দ স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

অতএব, এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের মুসলমান ভাই ও বোনদের মধ্যে কেউ কেউ অবগত না হওয়ার মানে এই নয় যে বিষয়টির অস্তিত্ব নেই। তাসাউফ শব্দটি নিজে নিজেই একটি সংজ্ঞা, যা অন্য কোনো যথাযথ/উপযুক্ত সংজ্ঞার সাথে অদলবদলযোগ্য তাযকিয়্যাত আন্ নফস্ ও এহসান সম্পর্কে ধারণাগুলো ব্যাখ্যা করার জন্যেই এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেউ নিজেকে সূফী বলাটা অনেকটা 'আমি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তীর্ণ বলে আযহারী' বলার মতোই ব্যাপার। এটি একটি টাইটেল তথা খেতাব কিংবা বিশেষণের ব্যবহারমাত্র এতে এর ব্যবহারকারীরা মুসলমান না হওয়ার মতো কোনো কিছু বোঝায় না। 'আযহারী' শব্দটি কুরআন বা হাদীসে কোথাও পাওয়া যায় না। তবে এই শব্দটি একটি ধারণাকে দ্রুত চিহ্নিত করার জন্যেই ব্যবহৃত হয়।

কারো 'তাসাউফ' শব্দটি পছন্দ না হলে তা তার ব্যবহার করা উচিত নয়। তিনি অন্যান্য বেশ কিছু সমার্থক শব্দের মধ্য থেকে কোনো একটি ব্যবহার করতে পারেন, যে শব্দগুলো আমরা শায়খ আদলীর প্রশ্নগুলোর জবাবে পেশ করবো। কিন্তু আধুনিকতাবাদী ও প্রাচ্যবিদ্যায় জ্ঞানীদের দ্বারা আরোপিত কিছু নেতিবাচক ধারণার দরুন কেউ যদি তাসাউফ শব্দটিকে পছন্দ না করেন, তাতে এর অর্থ এই দাঁড়াবে না যে মহান উলেমাবৃন্দ এই শব্দটিকে ইসলামী জ্ঞানের শাখা এবং ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় অংশ হিসেবে সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যা করেননি। ইবনে তাইমিয়া-ও তার প্রণীত 'মজমুয়ায়ে ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া' (ইবনে তাইমিয়ার ফতোওয়া সমগ্র) শীর্ষক পুস্তকের ১০ম খণ্ডে (এলম আস্ সুলূক) ও ১১তম খণ্ডে (আত্ তাসাউফ) ব্যাখ্যা করেছে। আমরা যেহেতু সবাই মুসলমান, আর এও জানি যে ইবনে তাইমিয়া আলেম

(মুফতী) ছিল, সেহেতু তাসাউফ-কে অস্বীকার করার মানে হবে ইবনে তাইমিয়া ও অন্যান্য আলেমমণ্ডলী এই বিষয়ে যা বলেছিলেন তাকে অস্বীকার করা। ইবনে তাইমিয়্যার এতদসংক্রান্ত শিক্ষাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, যেমনটি করেন পাঠকদের অনেকেই। আর তাই তার এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত মতামত জানা এক্ষণে জরুরি। তবে এই বিষয়ে তার ১৪০০ পৃষ্ঠার বিশাল ফতোওয়াটি অনুবাদ করা বড় কঠিন একটি কাজ; এই কাজ সময়সাপেক্ষ-ও। ইনশা'আল্লাহ আমাদের সাধ্যানুযায়ী আমরা সময়-সুযোগমতো এতদসংক্রান্ত সেসব অর্থ, ধারণা ও সংজ্ঞা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবো।

আমি (শায়খ হিশাম কাব্বানী) আরবীয় হওয়ার দরুন আমার পক্ষে তাসাউফ-সম্পর্কিত বিভিন্ন সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও শব্দের অনুবাদ করা একটু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই আপনারা আমাকে মাফ করবেন। কেননা, এই কাজে তাড়াহুড়ো করা যায় না এবং উল্টাপাল্টা উত্তর দেয়াও যায় না। বরঞ্চ আমরা শায়খ আদলী'র প্রশ্নের উত্তর দেয়ার খাতিরে কুরআন-হাদীসের আলোকে তাসাউফ (সূফীতত্ত্ব)-কে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছুক। আমরা তাসাউফ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করার আশা রাখি ইনশা'আল্লাহ, যে শব্দটির সাথে 'তাযকিয়্যাত আন্ নুফূস' বা 'এহসান' শব্দগুলোর অর্থের দিক থেকে কোনো পার্থক্য-ই নেই। 'এহসান' হলো অন্তরের এমন এক অবস্থা যা কুরআন ও হাদীস পাঠের সময় চোখে পানি আনে; দুনিয়ার মোহে সময় অপচয় করার জন্যে কারো মনে অনুতাপের সঞ্চার করে; আর তাকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ ও পরকালীন জীবনের আশীর্বাদ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষী করে তোলে।

কোনো কোনো লেখকের একটি বই লেখার জন্যে প্রয়োজন হয় দুই বা তিন বছর। এই বিশাল বিদ্যাশাস্ত্র যেটি ব্যাখ্যা করতে বই লেখাই বিহিত, সেটি সম্পর্কে এতো স্বল্প পরিসরে আমাদের কাছ থেকে একখানি সুন্দর ব্যাখ্যা কোনো যুক্তিসঙ্গত চিন্তাধারার মানুষ আশা করেন বলে আমি মনে করি না। তথাপিও আমরা ধীরে ধীরে ইবনে তাইমিয়্যা ও ইবনে কাইয়্যেম আল-জাওযিয়্যার সূফীতত্ত্ববিষয়ক উদ্ধৃতিগুলো, 'এলম আস্ সুলূক', 'এত্তেহাদ' 'ফানা', মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা শাফায়াতের ব্যাপারগুলো এবং অন্যান্য

অসংখ্য বিষয় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হবো; এগুলো ইবনে তাইমিয়্যা, ইবনে কাইয়্যেম ও ইবনে কাসীরের বইপত্রে উল্লেখিত হয়েছিল। মুসলমান ভাই ও বোনেরা অনেকেই এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনবধান রয়েছেন, কেননা এগুলো শুধু আরবী ভাষায় বিদ্যমান এবং অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়নি।

এ যাবত আমরা ইবনে তাইমিয়্যা, ইবনে কাসীর ও ইবনে কাইয়্যেম ছাড়া আর কারো বই অনুবাদ করিনি। আমরা এখনো ব্যাখ্যা করিনি ইসলামের অন্যান্য উলামাবৃন্দ কীভাবে এই সব শব্দকে বিশ্লেষণ করেছেন। কেননা, একদিন না একদিন এই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, কিন্তু ইসলামী শিক্ষার অবসান হবে না। আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান:

قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

–(হে রাসূল) আপনি বলে দিন, যদি সমুদ্র আমার রব্বের বাণীসমূহ লেখার জন্যে কালি হয়, তবে অবশ্যই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আমার রব্বের বাণীসমূহ শেষ হবে না; যদিও আমি অনুরূপ আরো (সমুদ্র) এর সাহায্যার্থে নিয়ে আসি।[৩]

ওপরোক্ত সূরা কাহাফে উল্লেখিত আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান হচ্ছে এক অতল মহাসাগরসদৃশ। এ কারণেই ইবনে কাসীর ও সাইয়্যেদ কুতূবের মতো মোফাসসিরীন (কুরআন ব্যাখ্যাকারীরা) পবিত্র কুরআন মজীদের বহু ব্যাখ্যামূলক বড় বড় বই লেখেছে। এই আলেমরা যা লিখেছে, তা কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই বের করা বিষয়, যদিও সর্বসাধারণ সেগুলো পড়ে মর্মোদ্ধারে অক্ষম।

কুরআন ও হাদীসে নিহিত জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা

কুরআন মজীদ আনুমানিক ৫০০ পৃষ্ঠায় ধারণকৃত। বুখারী ও মুসলিম শরীফে গৃহীত হাদীসের সংখ্যা মোটামুটি ৫০০০ থেকে ৭০০০ হবে। তবু আমরা দেখতে পাই যে এই কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ ব্যাখ্যা করতেই হাজার হাজার বইপত্র লেখা হয়েছে। আমরা যদি একজন

৩. আল কুর'আন : সূরা আল কাহাফ, ১৮/১০৯; মুফতী আহমদ এয়ার খান প্রণীত 'নূরুল এরফান'।

ব্যক্তিকে, অর্থাৎ, ইবনে তাইমিয়্যাকে উদ্ধৃত করি, যা আমরা করতে চাই, তাহলে আমরা দেখবো যে তার শুধু ৩৭টি পুস্তকই আছে স্রেফ ফতোওয়ার, যেগুলো এমন কি ব্যাখ্যাও নয়। এমতাবস্থায় কারো পক্ষে এ কথা বলা কীভাবে সম্ভব যে 'এটি কুরআন ও হাদীসে কোথায় আছে?'

ইসলামী উলামাবৃন্দ-ই প্রণয়ন করেছিলেন 'এলম আন্ নাহু' (আরবী ব্যাকরণগত জ্ঞান), 'এলম আল-আজায', 'এলমুল কালাম' (কুরআনের অলৌকিক প্রাঞ্জল ভাষা ব্যাখ্যামূলক জ্ঞান), 'এলম আত্ তাওহীদ' (আল্লাহর একত্ববিষয়ক জ্ঞান), 'এলম আল-আকীদাহ' (ইসলামী বিশ্বাসসংক্রান্ত জ্ঞান), 'এলম আল-কুরআন' (কুরআন-সম্পর্কিত জ্ঞান), 'এলম আল-ফেকাহ' (ইসলামের প্রায়োগিক বিধানসংক্রান্ত জ্ঞান), 'এলম আল-হাদীস' (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাণীসম্পর্কিত জ্ঞান), 'এলম আস্ সীরাহ' (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবনচরিতবিষয়ক জ্ঞান), 'এলম আস্ সরফ' (আরবী ভাষা বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান), 'এলম আল-বয়ান' (ব্যাখ্যামূলক জ্ঞান), 'এলম আত্ তাফসীর' (আল-কুরআনের ব্যাখ্যামূলক জ্ঞান), 'এলম আত্ তাজবীদ' (সাদৃশ্যপূর্ণ তথা মিলিয়ে পঠনপদ্ধতিগত জ্ঞান), 'এলম আত্ তারতীল' (পরিবর্তনশীল পঠনপদ্ধতিগত জ্ঞান), 'এলম আত্ তাসাউফ' বা 'এলমুল এহসান' (আত্মপরিশুদ্ধিমূলক জ্ঞান যা চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনমূলক জ্ঞান নামেও সুপরিচিত) এবং 'এলম-উল-মেরাস্' (উত্তরাধিকারবিষয়ক জ্ঞান)। এসব জ্ঞান বা এগুলোর পরিভাষার কিছুই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিল না। কিন্তু এগুলোর হাকীকত বা বাস্তবতা বিদ্যমান ছিল; আর সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম পরবর্তী যে কোনো প্রজন্মের চেয়ে এগুলোর চর্চা আরও ভালোভাবে করেছিলেন।

আল্লাহ পাক কর্তৃক 'তাযকিয়্যাহ' (পরিশুদ্ধি)-এর কথা উল্লেখ

কুরআন মজীদে তাসাউফ-সম্পর্কিত জ্ঞান বা আত্মশুদ্ধিমূলক জ্ঞানের কথা উল্লেখিত হয়েছে:

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

–তিনি-ই (খোদা), যিনি উম্মী লোকদের মধ্যে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরণ করেন যেন তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের জ্ঞান দান করেন; আর নিশ্চয় নিশ্চয় তারা ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল।[৪]

এই আয়াতে আমরা চারটি অত্যাবশ্যকীয় মূলনীতি দেখতে পাই। এই চারটির একটি পরিশুদ্ধি (তাযকিয়্যাহ)-কে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে 'ওয়া ইউযাক্কিহিম'। এর মানে সকল প্রকার শেরক (আল্লাহর সাথে অংশীবাদ), কুফরী (অবিশ্বাস) ও পাপ হতে ঈমানদারবৃন্দের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে 'এহসান' অর্জনের জন্যে প্রস্তুত করা। এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনে কাসীর অনেক পৃষ্ঠা লিখেছে। 'তাযকিয়্যা' অর্থ 'পবিত্র করা', যার মানে হলো কাউকে বস্তুবাদী বা দুনিয়ার মোহাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে মুক্ত করে অন্তরের পবিত্র অবস্থায় তথা আধ্যাত্মিক পর্যায়ে উন্নীত করা।

'এহসান' অবস্থাটি তাসাউফ-বিদ্যার দ্বিতীয় অংশ, যেটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ'তে উল্লেখিত হয়েছে। এই পরিভাষা হাদীসে জিবরীল আলাইহিস সালাম নামের রেওয়ায়াতে বিবৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম-এর মাঝে বসেছিলেন, তখন হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম আবির্ভূত হয়ে 'ইসলাম' (ধর্মের মৌলভিত্তি), 'ঈমান' (মৌলিক বিশ্বাস) ও 'এহসান' (চারিত্রিক পূর্ণতালাভের অনুশীলনপদ্ধতি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন; এগুলোর

৪. আল কুর'আন : সূরা আল জুমু'আহ, ৬২-৩। মুফতী আহমদ এয়ার খান সাহেব কৃত 'নূরুল এরফান।

পারিভাষিক অর্থ জানতে চান। এই বিষয়টি আমরা আপাততঃ এক নজর বুলিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমাদের জবাব সম্পর্কে পাঠকদের আগ্রহের কারণে শায়খ আদলীর প্রশ্নের যে জবাব আমরা বর্তমানে তৈরি করছি, তাতে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে আরও বিস্তারিত লেখা হবে।

আমাদের দ্বারা ওপরে বর্ণিত জ্ঞানের শাখাগুলো এবং যে জ্ঞানের শাখাগুলো আমরা উল্লেখ করিনি সেগুলোও পাঁচ থেকে সাত হাজার হাদীস এবং আনুমানিক ৫০০ পৃষ্ঠাসম্বলিত কুরআন মজীদ হতে নিঃসৃত হয়েছে। এ তথ্যের সূত্রে আমরা বলতে পারি, 'কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের ব্যক্তিগত (মানে আপন আপন) পঠন বা অধ্যয়ন থেকে উলেমাবৃন্দ হাজার হাজার বইপত্র লেখেছেন, যেসব পুস্তকের ভিত্তিমূল হলো কুরআন ও হাদীস; তাঁরা ওই দুই উৎস থেকে (কোনোভাবেই) বিচ্যুত হননি, বরং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যুক্ত করেছেন মাত্র।'

ইবনে তাইমিয়্যার 'মজমুয়া-এ-ফাতাওয়া' ৩৭ খণ্ডের; ইবনে কাসীরের 'তাফসীর' ২০ খণ্ডের; সাইয়্যেদ কুতূবের 'কুরআন মজীদের ছায়ায়' শীর্ষক তাফসীরগ্রন্থ বিশাল। এমতাবস্থায় 'কুরআনের আয়াত বা হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে কোনো বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত না হলে তা ইসলামে নেই', কিছু লোকের এমন বক্তব্য বুদ্ধিমান কোনো মানুষের উপলব্ধির সাথে খাপ খায় না।

আমরা এমন কথা বলছি না যার কোনো ভিত্তি ইসলাম ধর্মে, কুরআন মজীদে বা সুন্নাহ'তে নেই। যেমন, শায়খুল ইসলাম পদের অধিকারী ইবনে কাসীর আজীবন মানে শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কুরআন ও হাদীস হেফয করতে ব্যয় করেছিল। স্রেফ 'দলীল কোথায়' বলে আমরা তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে প্রত্যাখ্যান বা বাদ দিতে পারবো না। কেননা তা কুরআন ও হাদীস থেকে আহরিত এ সকল আলেমের জ্ঞানের বাস্তবতার পরিপন্থী হবে।

অধিকন্তু, আমাদেরকে বলতে হবে যে 'এলমুম্ মিনাল 'উলূম' তথা সকল জ্ঞানের শাখার মধ্যে প্রতিটি শাখা, যা আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি, তার ভিত্তি অবশ্যই থাকতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ'তে। এর পরিপন্থী কোনো কিছু হতে পারবে না। আর আমাদের তথা মুসলমান সম্প্রদায়ের নিজেদের মাঝে কোনো কুসংস্কার, (ভিন্ন কোনো) দর্শন বা

আদর্শকে গ্রহণ করা উচিত হবে না। আমরা তা গ্রহণও করি না; আমরা শুধু কুরআন-হাদীসে যা আছে তা-ই গ্রহণ করি। মুসলমান ভাইদের মধ্যে কেউ কেউ অবগত না থাকার মানে এই নয় যে আমরা ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়েছি। বরং এর মানে হলো, আমাদেরকে সুন্নাহ ও শরীয়তবিরোধী বলে অভিযুক্ত না করে তাদেরকে এ সকল উৎস অধ্যয়ন ও যাচাই-বাছাই করার ক্ষেত্রে আরও গভীরে যেতে হবে।

আমরা আল্লাহ তা'আলার পাপী-তাপী বান্দা। এমন কি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আল্লাহর হাবীব, তিনিও দোয়া করতেন এভাবে, "হে আল্লাহ, আমাকে আমার 'নফস' (একগুঁয়ে সত্তা)-এর কাছে এক চোখের পলকের তরেও ছেড়ে যাবেন না।" আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতো পূর্ণতাপ্রাপ্ত নই; আর আমরা তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম-এরও মতো নই, বুযুর্গ উলামাবৃন্দ-ও নই। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আমরা দীন-হীন বান্দা, যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম-কে অনুকরণ ও অনুসরণ করতে সচেষ্ট। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। অতঃপর আমরা ইন্টারনেটে সকলকে সাক্ষী রেখে পুনর্ব্যক্ত করছি ইসলামী বিশ্বাসের সেই কলেমা-বাক্য 'আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ' যার অর্থ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ভিন্ন আর অন্য কোনো উপাস্য প্রভু নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন তাঁর প্রেরিত পয়গম্বর।' আমরা এও বলি যে আমরা শুধু আল্লাহ তা'আলারই এবাদত-বন্দেগী করি, আর তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উচ্চসিত প্রশংসা করে আত্মিক সুখ-ও লাভ করি।

শায়খ আদলীর প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা কিছু সময় নেবো। কিন্তু আমরা মুসলমান ভাই ও বোনদেরকে বলবো, 'অনুগ্রহ করে বিভিন্ন পাঠাগারে বিদ্যমান ইসলামী ভাবধারার সূফীতত্ত্ববিষয়ক বইপত্র খুঁজে বের করে পড়ুন; কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন বইপত্র নয়। ভণ্ড তাপসবর্গ যা করে তা আমাদের প্রতি আরোপ করবেন না। বরঞ্চ ইবনে তাইমিয়্যা তাসাউফ সম্পর্কে যা বলেছে, তা-ই দিয়ে আমাদেরকে যাচাই করুন।'

'এলম আল-'এরস্' (উত্তরাধিকার বিষয়ক জ্ঞান) সম্পর্কে ঘোষণা এসেছে আল-কুরআনের ৩-৪ পৃষ্ঠায়। তথাপি এ সকল আয়াত থেকে এই বিষয়ে হাজার হাজার (ব্যাখ্যামূলক) বই লেখা হয়েছে। আর 'এলম আত্ তাওহীদ' তথা আল্লাহ তা'আলার একত্ববিষয়ক জ্ঞান, যেটি সম্পর্কে বহু কুরআনের আয়াত ও হাদীসে বলা হয়েছে, সেটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে বিভিন্ন আলেম-উলামা বিভিন্ন মত ব্যক্ত করে সহস্র সহস্র বইপত্র লেখেছেন।

এলম আত্ তাওহীদ (আকীদা-বিশ্বাসসম্পর্কিত জ্ঞান)

আকীদা-বিশ্বাসসম্পর্কিত জ্ঞানের কথাই ধরা যাক الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى কুরআন মজীদের এই আয়াত।[৫] যার অর্থ "তিনি পরম করুণাময়, তিনি আরশের ওপর ইস্তিওয়া তথা সমাসীন হন, যেমনটি তাঁর মর্যাদার সাথে শোভা পায়", যা আল্লাহ তা'আলার আরশে সমাসীন হওয়া সংক্রান্ত, সেটি ব্যাখ্যা করতে ইবনে তাইমিয়্যার যুগের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম ও তাবেঈন রহমতুল্লাহি আলাইহিম -বৃন্দের পরবর্তী প্রজন্মের উলেমাবৃন্দ সহস্র সহস্র বই লেখেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সর্ব-ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী রহমতুল্লাহি আলাইহি, আস্ সৈয়ুতী রহমতুল্লাহি আলাইহি ও ইবনে হাজর হায়সামী মক্কী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বহু গ্রন্থপ্রণেতা ইবনে তাইমিয়্যাও তার পূর্ববর্তী অনেক প্রসিদ্ধ আলেমের পাশাপাশি তার সময়কার আলেমদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিল। ওই একটি আয়াতের ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার বইপত্র অস্তিত্ব পায়। তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিষয়গুলো সম্পর্কে তাকিদ দিয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম 'তাযকিয়ায়ে নফস্' (আত্মপরিশুদ্ধি) ও 'এহসান' অবস্থা অর্জনের পদ্ধতিগুলোর ব্যাপারে কী ফায়সালা হবে? এগুলোর জন্যে কি সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী উলামা তথা বুযূর্গানে দ্বীনের লিখিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসম্বলিত সহস্র সহস্র গ্রন্থের প্রয়োজন পড়বে না?

---

[৫]. আল কুর'আন : ত্বহা, ২০/৫।

পারিভাষিকভাবে এই জ্ঞান 'তাসাউফ' নামে সুপরিচিত। উদাহরণস্বরূপ, 'হাদীস' শব্দটির অর্থ যদি আমরা অভিধানে তালাশ করি, তাহলে দেখতে পাবো 'কাদীম তথা প্রাচীনের বিপরীত, জাদীদ (নতুন)' অথবা বিকল্পস্বরূপ 'কথিত কোনো কিছু।' অথচ পারিভাষিক শব্দ 'হাদীস'-এর সার্বিক সমঝ পেতে গেলে এর অর্থ আমরা দেখতে পাই 'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি-নীতি, ঐতিহ্য কিংবা এতদসংক্রান্ত জ্ঞান।' আর যদি আমরা 'সুন্নাহ' শব্দটি অভিধানে তালাশ করি, তাহলে দেখতে পাই যে এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হচ্ছে 'তরীকত', যার মানে 'পথ।' অতএব, আমরা যখন 'তরীকত' (পথ) শব্দটি উচ্চারণ করি, উলামা-এ-কেরাম তৎক্ষণাৎ বুঝে যান যে এর অর্থ সুন্নাহ। আমরা যখন বলি 'হাদীস্', ইসলামী পণ্ডিতবৃন্দ বুঝতে পারেন এর অর্থ 'নতুন।' কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরবর্তী সময়ে এ শব্দটির প্রতি আরোপিত অর্থ হচ্ছে তাঁর বাণী, কর্ম, আচার-আচরণ, শিষ্টাচার ইত্যাদি। 'হাদীস' শব্দটি আজকে যেমন 'সার্বিকভাবে' ব্যবহৃত হয়, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে তা 'কদাচিৎভাবে' ব্যবহৃত হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেসালের (আল্লাহর সাথে পরলোকে মিলনপ্রাপ্তির) পরেই সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম-এর যুগে এটি সার্বিকভাবে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়। ওই সময় এটি পারিভাষিক শব্দে পরিণত হয়, যা দ্বারা বোঝানো হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুমবৃন্দকে কী বলতেন, তাঁদের সাথে কী রকম আচরণ করতেন, তাঁর এবং তাঁদের মধ্যকার বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ, এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে কী কী বিদ্যমান ছিল তার বিবরণও।

'হাদীস' শব্দটির অর্থ

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي যার মানে হলো "আমার সুন্নাতের অনুসরণ করো এবং আমার পরে আগত খলীফাদের

সুন্নাতেরও অনুসরণ করো।"[৬] তিনি এ কথা বলেননি, عَلَيْكُمْ بِحَدِيثِي وَ حَدِيثِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي তিনি বলেননি, "তোমরা আমার হাদীস বা আমার পরে আগত খলীফাবৃন্দের হাদীসের অনুসরণ করো।"

পারিভাষিকভাবে তিনি যা বলেছেন তা হলো, "আমার তরীকত অনুসরণ করো এবং আমার খলীফাদের তরীকত-ও অনুসরণ করো।" মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যবহৃত শব্দটি হচ্ছে 'সুন্নাহ।' এতে প্রতীয়মান হয় 'হাদীস' শব্দটি, যাকে বর্তমানে সার্বিকভাবে বোঝা হয়, তা কীভাবে হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেসালের পরে ওই রূপ পরিগ্রহ করে, যে অর্থটি বিবৃত করে: "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এবং তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত সামগ্রিক জ্ঞানের শাখা তথা বিদ্যা।" আপনারা এখানে একে এভাবে দেখতে পারেন, 'এলমুল হাদীস' বিদ্যায় প্রবর্তন এমন এক জ্ঞানের কথা বলে যার অস্তিত্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিল না, কিন্তু যেটি ইসলামী উলামা-এ-কেরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিম প্রণয়ন করা জরুরি বিবেচনা করেছিলেন, যাতে করে ইসলাম ধর্মের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম-এর বাণী, আমল তথা আচরিত রীতিনীতি ও কর্মসম্পর্কিত জ্ঞানকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।

এ কারণেই আমরা দেখতে পাই সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম-এর পরে এবং হাদীস লিপিবদ্ধ হওয়ার যুগশেষে মোহাদ্দীসমণ্ডলী হাদীস শ্রেণীবিন্যাসকরণ ও সংরক্ষণের নিয়মকানুন ও পদ্ধতি তৈরি করা আরম্ভ করেন। আমরা আরও দেখতে পাই যে বিভিন্ন শ্রেণীর হাদীস বর্ণনা করতে নানা পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, 'এলম আল-হাদীস' শাস্ত্রে আমরা হাদীসের বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস পাই। এগুলোর একটি হলো 'সহীহ', যার অর্থ করা

[৬]. শরহু মুশকিলুল আছর : ৩/২২৩ হাদীস নং ১১৮৬।

হয়েছে, 'ভুলের বিপরীত।' এই 'সহীহ' শব্দটির ব্যাখ্যা করতে একটি গোটা গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন হবে। 'হাদীসে হাসান' শব্দটির ব্যাখ্যা করতেও আরেকটি পুরো বই লেখতে হবে।

আহাদীসের শ্রেণীবিন্যাস

এই শ্রেণীবিন্যাসের পরবর্তী ধাপ/পর্যায় হলো 'হাদীস যয়ীফ'। এরপর ক্রমানুসারে 'হাদীস মারফূ', 'হাদীস মুসনাদ', 'হাদীস মুত্তাসিল', 'হাদীস মওকুফ', 'হাদীস মাকতু', 'হাদীস মুনকাতী', 'হাদীস মু'আদল', 'হাদীস মুরসাল', 'হাদীস মু'আলাক', 'হাদীস মুসালসাল', 'হাদীস গরীব', 'হাদীস আযীয', 'হাদীস মাশহুর', 'হাদীস মুতাওয়াতের', 'হাদীস মু'আনা'আন', 'হাদীস মুবহাম', 'হাদীস মুদাল্লাস্', 'হাদীস আশ্ শায়ায', 'হাদীস মাহফূয', 'হাদীস মুনকার', 'হাদীস মা'রফূ', 'হাদীস আলিই ওয়ান-নাযিল', হাদীস মুদাররাজ', 'হাদীস মুদ্দাবাজ', 'হাদীস মুত্তাফফাক', 'হাদীস মুফতারাক', 'হাদীস মু'তালিফ', 'হাদীস মুখতালিফ', 'হাদীস মাকলুব', 'হাদীস মুদতারিব', 'হাদীস মু'আল্লাল', 'হাদীস মাতরুক', এবং সবশেষে 'হাদীস মাওযু'।

অতএব, আমরা পেলাম হাদীসের ৩৫টি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিন্যাস, যা উলেমাবৃন্দ হাদীস অধ্যয়নের সময় ব্যবহার করেন এবং যা দ্বারা তাঁরা হাদীসের শ্রেণীবিন্যাস করেন। এভাবেই ইসলামী পণ্ডিতমণ্ডলী জানতে পারেন কোন্ হাদীস গ্রহণযোগ্য, আর কোনটি গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে একটি যৌক্তিক প্রশ্নের উদ্ভব হতে পারে আর তা হলো, "কুরআন বা সুন্নাহ'তে আক্ষরিকভাবে কোথায় এই শব্দগুলো পাওয়া যায়?" আর এরই ধারাবাহিকতায় আরও একটি যৌক্তিক প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই জ্ঞানের বা বিদ্যার শাখা সৃষ্টির এবং এই শ্রেণীকরণ ও শব্দগুলো প্রবর্তনের অনুমতি কখন এলো? কেননা, এ তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি।

বস্তুতঃ এসব শ্রেণীবিন্যাস অস্তিত্ব পেয়েছে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর মতো মোহাদ্দেসীনবৃন্দের আগমনের পর, যাঁরা 'এলমুল হাদীস'-এর উসূল তথা মূলনীতি প্রণয়ন ও সেগুলোর শ্রেণীকরণ করেন; আর এগুলোর কোনোটি-ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জমানায় ছিল না। আরেক কথায়, হাদীসের

এই শ্রেণীবিন্যাস কুরআন মজীদ বা সুন্নাহ'তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়নি; কিংবা সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুমদের যুগেও এগুলোর অস্তিত্ব ছিল না; বরং এগুলোকে পরবর্তীকালে উলেমাবৃন্দ-ই সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরতে সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম-এর যুগে হাদীস ও সুন্নাহ'র জ্ঞান অস্তিত্বশীল ছিল। কেননা, সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী (আহাদীস) ও কর্ম (সুন্নাহ) সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং এই জ্ঞান শিক্ষাও দিতেন। কিন্তু ওই সময় এটি কোনো বিদ্যাশাস্ত্র হিসেবে জ্ঞাত ছিল না। অতঃপর যখন হযরতে সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম একে একে বেসালপ্রাপ্ত হওয়া আরম্ভ করেন, আর তাবেঈনবৃন্দ-ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর খলীফামণ্ডলী কী কী বলেছিলেন এবং কী কী করেছিলেন তা জানার জন্যে চেষ্টা করতে থাকেন, তখন-ই হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুমবৃন্দের বাণী ও জীবনভিত্তিক কর্ম লিপিবদ্ধ এবং বর্ণনা করার জন্যে কোনো পদ্ধতি তৈরির প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে দেখা দেয়। তাই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের সঙ্গে সময়ের দূরত্ব বৃদ্ধির কারণে রেওয়ায়াতের তথা বর্ণনা-পরম্পরার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আনুষ্ঠানিক কাঠামো ও যাচাই-পদ্ধতি যুক্ত করা জরুরি হয়ে পড়ে; আর এতে সবসময়ই 'সনদ' তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম সম্পর্কিত তথ্যাদির বর্ণনাকারীদের যাচাইযোগ্য পরম্পরা অন্তর্ভুক্ত রাখা হতে থাকে।

অন্যদিকে, অসংখ্য অনারব ভাষাভাষী মানুষ দ্বীন-ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ায় এবং হাদীস মুখস্থ করার কারণে 'রাবী' তথা বর্ণনাকারীদের বিদ্যাশাস্ত্র ও 'রেওয়ায়াত' তথা বর্ণনার বিদ্যাশাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করা জরুরি হয়; এরই ফলশ্রুতিতে আহাদীসের ৩৫টি শ্রেণীবিন্যাস করা হয়, আর এগুলোর কোনোটিরই অস্তিত্ব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিল না। অতএব, আমরা দেখতে পাই একটিমাত্র 'হাদীস' শব্দ, যেটি শেখা ও প্রচারের জন্যে হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুমকে জোর তাকিদ দিয়েছিলেন, সেটি নিজস্ব (পারিভাষিক) শব্দাবলী ও পদ্ধতিসহ একটি মহা-বিদ্যাশাস্ত্রে পরিণত হয়; আর এগুলোর অস্তিত্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিল না। তাঁর জমানায় হাদীসের প্রচার ও যাচাই ছিল স্বাভাবিক, আনুষ্ঠানিক নয়। আর এখন 'এলম আল-হাদীস' নিজেই একটি বিদ্যাশাস্ত্র। আজকে অনেক পণ্ডিত এই শাস্ত্রে বিশেষায়িত শিক্ষা নেন, আর তাঁদেরকে বলা হয় 'মোহাদ্দেসীন'।

অনুরূপভাবে, আরবী ব্যাকরণ ও 'তাশকিল' (লেখা বা মুদ্রণে ব্যবহৃত বিশেষ চিহ্ন যা দ্বারা কোনো বর্ণের বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের পরবর্তী সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবর্তিত হয়, যখন পরিবর্তন ও ভুল উচ্চারণ থেকে কুরআন-হাদীসের আরবী ভাষাকে মুক্ত রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। আজকের আরবীয়দের সেই চিরায়ত আরবী ভাষা সংরক্ষণের জন্যে অবশ্যই 'নাহু' ও 'তাশকিল' শিখতে হবে। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জমানায় এই ভাষার 'ফিতরা' (নির্দোষ) অবস্থার কারণে এমন কি একজন শিশু-ও শুদ্ধ আরবী জানতো।

একইভাবে, কুরআন ও সুন্নাহ'তে শেকড় গেড়ে থাকা 'তাসাউফ' শাস্ত্র-ও একটি মহা-বিদ্যাশাস্ত্র, যাকে বিভিন্ন ভাগে ও শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে এবং যার গভীরতা বর্ণনার জন্যে অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ বিদ্যমান। অতএব, আপনারা কি আমাদেরকে মাত্র একটি সংক্ষিপ্ত শব্দে তাসাউফের সংজ্ঞা দিতে বলেন, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইসলামধর্মে রয়েছে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার, যার প্রতিটি বিষয় ও বিদ্যা ('এলমুন মিনাল উলূম')-ই নানা শব্দ ও শ্রেণীতে বিন্যস্ত, এবং যার ওপরোক্ত আহাদীসের ৩৫টি শ্রেণীবিন্যাসের কথাই কুরআন বা সুন্নাহ'তে উল্লেখিত হয়নি? আরও মনে রাখবেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় এমন কি 'হাদীস' শব্দটিও আজকে মুসলমানদের দ্বারা যেভাবে ব্যবহৃত হয় সেভাবে ব্যবহৃত হয়নি।

হাদীসের আলেম-উলেমা (মোহাদ্দেসীন)

ইতিপূর্বে যা আলোচিত হয়েছে তা থেকে আমরা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অধ্যয়ন না করে তাঁর সুন্নাহ'কে উপলব্ধি করা অসম্ভব। আর হাদীসের আলেম-উলেমাদের কাছে না গিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অধ্যয়ন করা একেবারেই অসম্ভব। এ সকল মোহাদ্দেসীনের অন্যতম হলেন ইমাম মালেক (৯৫ হিঃ), যিনি হেজায অঞ্চলের ফেকাহ ও হাদীসের ইমাম, এবং যাঁর 'আল-মোওয়াত্তা' গ্রন্থখানা প্রস্তুত করতে সময় লেগেছিল ৪০ বছর। সময়কাল হিসেবে তাঁর পরবর্তী মোহাদ্দেস ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১হিজরী), যিনি লিখেছিলেন 'আল-মুসনাদ' নামের বই, যা'তে তিনি তাঁর মুখস্থকৃত ৭,৫০০০০ হাদীস হতে তাঁরই দ্বারা বাছাইকৃত আহাদীস সংকলন করেছিলেন। এই আলেমবৃন্দ ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর যুগের আগেকার, এবং তাঁরাই হাদীসের উসূল তথা নীতিমালা প্রণয়ন করেন। কাজেই আমরা সর্ব-ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি ও আহমদ রহমতুল্লাহি আলাইহি-সহ আটজন ইমামকে পেয়েছি, যাঁরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেশ কিছুকাল পরে হাদীস সংকলন করেন। সুতরাং ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর যদি হাদীস সংকলন করে বই লেখতে ৪০ বছর লাগে, তাহলে 'এলম আত্ তাসাউফের' মতো অনুরূপ ব্যাপক এক বিদ্যাশাস্ত্র সম্পর্কে সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেয়ার ব্যাপারটি এতো অল্প সময়ে ও এমন স্বল্প পরিসরে কীভাবে কারো কাছ থেকে আশা করা যেতে পারে আপনারাই বলুন!

আজকাল ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সমস্যা হলো, তারা আমাদের ধর্মকে অত্যন্ত অগভীর, 'রেডিমেড' ও সহজে হজম হওয়ার প্রক্রিয়াজাতকৃত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিখতে চান। কিন্তু এই ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব অসীম, ব্যাপক ও সুগভীর; আর এটি মানব মস্তিষ্কের সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ নয়, যেমনটি সীমাবদ্ধ অন্যান্য ধর্ম।

আমি যা বলেছি, আমার (দ্বীনী) ভাই ও বোনদের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি জ্ঞাপন চাই আমি। যে কোনো প্রকৃত আলেম-ব্যক্তিকে হাদীসের এই শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে জানতে এবং তা ব্যবহার করতে সামর্থ্যবান হতে হবে। এমতাবস্থায় আমি জানতে চাই, কুরআন ও সুন্নাহ'তে

কোথায় আক্ষরিকভাবে (আহাদীসের) এই ৩৫টি শ্রেণীর কথা উল্লেখিত হয়েছে? এটি একটি সহজ উদাহরণ। আমরা ওপরে উল্লেখিত 'উলূম' (বিদ্যাশাস্ত্রগুলোর)-এর প্রতিটির ক্ষেত্রেই একই রকম প্রশ্ন ছুঁড়তে পারি। বস্তুতঃ এক্ষণে যে প্রশ্ন দাঁড়ায় তা হলো, "কুরআন ও হাদীসের কোথায় নামসহ ইসলামী বিদ্যাশাস্ত্র (উলূম)-গুলো বিধৃত হয়েছে?"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে লিপিবদ্ধ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান,

خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

–আমার এই শতাব্দী হলো সেরা, এরপর সেরা হলো পরবর্তী শতাব্দী।[৭]

আর অন্যান্য রেওয়ায়াতে তিনি ফরমান, "(সেরা হচ্ছে) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দী।" সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম এর পরে ছিলেন তাবেঈন, এরপর তাবে' তাবেঈনবৃন্দ। ইসলামের সকল জ্ঞান বিশারদ-ই বলেছেন যে তাবেঈনবৃন্দের যুগ শেষ হয়েছিল ১৫০ হিজরী সালের দিকে; আর তাবে' তাবেঈনদের যুগ সমাপ্ত হয় ২২০ হিজরী সাল নাগাদ। আমরা দেখতে পাই যে সর্ব-ইমাম আবূ হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি, মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি, শাফেঈ রহমতুল্লাহি আলাইহি ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহি আলাইহি সবাই ওই সময়কার। ইমাম আবূ হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর জন্ম ৮০ হিজরী সালে; ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর ৯৫ হিজরীতে; ইমাম শাফেঈ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর আনুমানিক ১৫০ হিজরীতে; আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর ১৬০ হিজরী সালে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে যুগকে 'সেরা সময়' বলেছিলেন, এঁরা সবাই ওই সময়-ই আবির্ভূত হন, আর তাঁদের পরবর্তী সময়ে আগত উলামা-মণ্ডলীর সাথে তা ছিল বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। তাঁরা সবাই বিভিন্ন 'উলূম' তথা বিদ্যাশাস্ত্রের নামগুলো, যেগুলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরবর্তী সময়ে

---

৭. মুয়াত্তা : ইমাম মালেক ,বাবুর রাজুলি ইনদাহুশ শাহাদা ৩/২৯৫, হাদীস ৮৪৭।

প্রবর্তিত হয়েছিল, সেগুলো গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এসব শাস্ত্রের মধ্যে ছিল, উদাহরণস্বরূপ, 'এলম আন্ নাহু', 'এলম আল-আজায', 'এলম আল-কালাম', 'এলম আত্ তাওহীদ', 'এলম আল-আকীদা', 'এলম আল-কুরআন', 'এলম আল-ফেকাহ', 'এলম আল-হাদীস', 'এলম আস্ সীরাহ', 'এলম আস্ সরফ', 'এলম আল-বয়ান', 'এলম আত্ তাফসীর', 'এলম আত্ তাজবীদ', 'এলম আত্ তারতীল', 'এলম আত্ তাসাউফ' ('এলম আল-এহসান') ও 'এলম আল-মিরাস্'।

আমাদের মুসলমান ভাই ও বোনেরা, আমরা আনন্দিত যে আমরা এই তাসাউফ-সম্পর্কিত বিষয়ে কথা বলতে পারছি এবং আপনাদের সাথে পরিচিত হতে পারছি; আর এতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে এবং একে অপরের মতামতকে সম্মান করেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারছি; আর এই আলোচনা থেকে আমরা সবাই উপকৃত-ও হচ্ছি। কিন্তু আমাদেরকে পারস্পরিক দোষারোপ থেকে মুক্ত থাকতে হবে, কেননা তা পাপের উৎস হতে পারে। এক্ষেত্রে আল্লাহ পাক ফরমান, إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ –"নিশ্চয় কিছু কিছু ধারণা (সন্দেহ) পাপ।[৮]" তাই আমরা বলি, "আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও আপনাদের ক্ষমা করুন। আর একমাত্র তাঁরই উপাসনা করার এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত না হবার জন্যে তিনি আমাদেরকে সামর্থ্য দিন, আমীন।"

অতএব, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা শায়খ আদলীর উত্থাপিত প্রশ্নমালাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি না। কিন্তু যেহেতু তাঁর জিজ্ঞাসিত বিষয়টি ব্যাপক, সেহেতু আমাদের কাছ থেকে যাঁরা জবাব আশা করেন তাঁদের প্রতি অন্যায় করা হবে যদি এই বিষয়ের প্রাপ্য উত্তরের চেয়ে ঘাটতিপূর্ণ কোনো উত্তর আমরা দেই। উপরন্তু, আমরা সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করবো এ বিষয়ের দিকে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের পরে বিভিন্ন সময়ে অনেক শব্দ ও বিদ্যাশাস্ত্রের প্রবর্তন করা হয়েছে।

৮. আল কুর'আন : আল হুজুরাত, ৪৯/১২।

আশা করি আপনারা আমাদের দ্বারা শায়খ আদলীর উত্থাপিত প্রশ্নমালার জবাব অবিলম্বে না দেয়ার কারণে হতাশ হননি। দুই-চার কিংবা এমন কি দশ পৃষ্ঠায়ও অতি সাধারণ একখানা ব্যাখ্যা দেয়া এক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে না; কেননা 'তাযকিয়্যা'-সম্পর্কিত জ্ঞান ও 'এহসান' অবস্থার সংজ্ঞাগত ভিত্তিস্বরূপ বিভিন্ন কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ উল্লেখ করতে মহা 'যুহদ' (প্রচেষ্টা)-এর প্রয়োজন। আমাদের দ্বীনী ভাই ও বোনেরা যদি জিজ্ঞেস করেন আমরা কেন এখানে হাদীসের প্রসঙ্গ টেনে এনেছি, তাহলে তাঁদের বুঝতে হবে যে আমরা এই শাস্ত্রকে ইচ্ছাকৃতভাবে উল্লেখ করেছি উদাহরণস্বরূপ; কেননা আমাদের অধিকাংশেরই এ শাস্ত্রে জ্ঞান ও উপলব্ধি আছে। তাই এ শাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে আমরা কোনো ব্যাখ্যা পেশ করলে সবাই তা সহজে বুঝতে পারবেন। আর যদিও বা এই শাস্ত্রটি সর্বজনবিদিত, তবুও ইতিপূর্বে প্রদত্ত হাদীসের ৩৫টি শ্রেণির আলোকে এটি স্পষ্ট যে আমাদের অধিকাংশেরই এ বিদ্যা সম্পর্কে প্রারম্ভিক জ্ঞান বিদ্যমান।

কিন্তু আমরা যখন 'তাসাউফ'-এর মতো একটি শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করবো, যার সাথে শ্রোতামণ্ডলী ভালোভাবে পরিচিত নন, তখন এই বিদ্যা সম্পর্কে আমাদেরকে একটি সম্যক ধারণা পেতে হবে যাতে আমরা একে ব্যাখ্যা করতে পারি এবং এর উপযোগী শব্দাবলী ও নীতিমালা দ্বারা একে পরবর্তী পর্যায়ে সংজ্ঞায়িত করতে পারি; অধিকন্তু এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চিহ্নিত এবং কুরআন-হাদীসে এর ভিত্তিও তুলে ধরতে পারি। এটি করতে হলে এর ইতিহাস ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার পদ্ধতি সম্পর্কে শ্রোতামণ্ডলীকে সম্যক ধারণা দেয়া জরুরি। তাই আবারো আমরা পাঠকমণ্ডলীকে অনুরোধ করবো তাঁরা যেন আমাদের প্রতি মূল কথা না বলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্য কথা বলার দোষারোপ না করেন; বরং তাঁরা যেন উপলব্ধি করেন যে আমরা শায়খ আদলীর উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেয়ার ভিত্তি-ই রচনা করছি। আর কেউ যদি মনে করেন যে আমাদের উত্তর সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত, তাহলে আমরা জিজ্ঞেস করবো "শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীস থেকে বের করা একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দ্বারা কি হাদীসের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে জানা ও বোঝা আদৌ সম্ভব?" অতএব, আমরা ইমাম আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -এর কথারই প্রতিধ্বনি করবো। তিনি বলেন, اَلْاِنْسَانُ عَدُوٌّ لِمَا يَجْهَلُ মানে "মানুষ যা

জানে না তারই প্রতি সে বৈরীভাবাপন্ন।" এমতাবস্থায়, আমরা যা জানি না তা প্রত্যাখ্যানের পরিবর্তে আমাদের মন ও মস্তিষ্ককে উন্মুক্ত রাখা একান্ত আবশ্যক, যেমনটি প্রয়োজন 'এলম আত্ তাযকিয়্যা' তথা 'তাসাউফ' শাস্ত্র হিসেবে খ্যাত পরিশুদ্ধিবিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে।

এক্ষণে আমরা যেহেতু শায়খ আদলীর প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য এবং যেহেতু তিনিও উল্লেখ করেছেন যে এটি নও-মুসলিম ও 'তাসাউফ' শব্দের সাথে অপরিচিত মুসলমানদের অবগতির খাতিরে করা প্রয়োজন, আর আমরাও যেহেতু সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে চাই নি, সেহেতু আমরা আমাদের সফরসূচির আগেই এর ত্বরিত জবাব দিচ্ছি কেননা আমাদেরকে এই প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অতএব, দীর্ঘ ও যথাযথ জবাব তৈরির উদ্দেশ্য আমাদের অন্তরে থাকলেও ত্বরিত উত্তরের জন্যে চাপ প্রয়োগ হওয়ায় আমরা আগামী দিন বা তৎপরবর্তী দিন একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ পেশ করবো, ইনশা'আল্লাহ।

জাযাকুম আল্লাহ খায়রান আলাইকুম
–শায়খ হিশাম মুহাম্মদ কাব্বানী

[এক]
ছয়টি প্রশ্নের উত্তর

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু 'আলা নাবিই-ইনা মুহাম্মদ ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া সাল্লাম।

হে শায়খ আদলী! আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।
অনুগ্রহ করে এই উত্তরের সংক্ষিপ্ততার জন্যে মাফ করবেন। কেননা, আমরা মনে করি এই বিষয়টি আরও বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। তবে কোনো ওয়েবসাইটের জন্যে এটি যথেষ্ট একখানা খোরাক হবে। আমরা আরও কিছু রেফারেন্সের একটি তালিকা এতে দেবো, আগ্রহী পাঠকবৃন্দ ইসলামী তাসাউফ-শাস্ত্র সম্পর্কে নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে যেগুলোর শরণাপন্ন হতে পারবেন।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর: "তাসাউফ কী?"

"তাসাউফ কী? অনুগ্রহ করে এই পারিভাষিক শব্দের বিস্তারিত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিন এবং সেই সাথে খোদ শব্দটির মানেও উল্লেখ করুন।" এই প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি:

আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমরা আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পাই যে আপনি 'তাসাউফ কী' প্রশ্নটিকে আপনারই এতদসংক্রান্ত সংজ্ঞা ও শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে চাওয়ার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এর মানে হচ্ছে আপনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে এটি স্রেফ একটি পারিভাষিক শব্দ, যেটি এমন একটি অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে ব্যবহৃত হয়েছে, যে অবস্থা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় উল্লেখিত হয়েছিল। অতঃপর আপনি ওই শব্দটিকেই ব্যাখ্যা করতে বলেছেন, যার দরুন 'তাসাউফ' যে একটি বিষয়কে বোঝানোর জন্যে ব্যবহৃত কোনো পারিভাষিক শব্দ তার প্রতি আপনি ইঙ্গিত করেছেন।

এ পারিভাষিক শব্দকে আমরা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হবো। কেননা, বিভিন্ন জায়গা থেকে এতোগুলো অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি; যদিও আমরা পাঠকমণ্ডলীর খেদমতে এর পটভূমি রচনায় আরও সময় দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু

এসব প্রশ্ন থেকে আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছি মর্মে অনেক অভিযোগের কারণে আমরা তা সংক্ষেপ করেছি।

এ কথা নিশ্চিত এবং সর্বজনবিদিত যে এই শতাব্দীতে 'তাসাউফ' শাস্ত্র সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধিগত বিভিন্নতা বিদ্যমান। কিছু মানুষ মনে করেন এই শাস্ত্র ইসলামবিরোধী এবং শরীয়ত, কুরআন বা সুন্নাহ'তে এটি উল্লেখিত হয়নি। অপরদিকে, ইবনে তাইমিয়্যার অনুসারীরা এবং চার মযহাবের ইমামমণ্ডলীর অনুসারীবৃন্দ আর সর্ব-ইমাম আস্ সুবকী রহমতুল্লাহি আলাইহি, আস্ সৈয়ুতী রহমতুল্লাহি আলাইহি, ইবনে হাজর হায়সামী রহমতুল্লাহি আলাইহি ও অন্যান্য পরবর্তী যুগের ইমামমণ্ডলীর অনুসারীবৃন্দ সবাই 'তাসাউফ'কে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন; আর তাঁরা এও জানতেন যে এ বিদ্যাশাস্ত্রের শেকড় কুরআন-সুন্নাহ ও শরীয়তের গভীরে প্রোথিত। এই মহান আলেম-উলেমা 'তাসাউফ'কে গ্রহণ করেছিলেন, কেননা তারা এই শব্দের অর্থগত বাস্তবতা সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণ ওয়াকেফহাল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে 'তাসাউফ' শব্দটি পরিচিত ছিল না। তবে নামটি নতুন হলেও এর মর্ম ধর্মের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল এবং তা ছিল অবিচ্ছেদ্য। 'তাসাউফের' উদ্দেশ্য হচ্ছে পাপ হতে নিঃসৃত সব ধরনের মন্দ স্বভাব, অশুভ অভিপ্রায় ও অশুচিতা অন্তর থেকে অপসারণ করে তাকে সদাচরণ ও সৎস্বভাব দ্বারা সুশোভিত করা, যা পবিত্র আল-কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ আমাদের কাছে দাবি করে থাকে। এর লক্ষ্য হচ্ছে 'এহসান' অবস্থা সৃষ্টি তথা চারিত্রিক পূর্ণতা সাধন করা, যেটি ছিল হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (আধ্যাত্মিক) অবস্থা; আর যে অবস্থা অর্জনের জন্যে আসহাবে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম ছিলেন সদা সচেষ্ট।

তাসাউফ = তাযকিয়্যাত আন্ নফস্

'তাসাউফ' শব্দটিকে ইতিপূর্বে অন্তর পরিশুদ্ধিকরণের উপায় হিসেবে চিহ্নিত করা হতো; যাকে মূলতঃ কুরআন মজীদে 'তাযকিয়্যাত আন্ নফস্' নামে উল্লেখ করা হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে যেটি 'তাসাউফ বিদ্যা' নামে সুপরিচিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এই 'এলম' (বিদ্যাশাস্ত্র)

'যুহদ' (কৃচ্ছ্রব্রতসম্পর্কিত বিদ্যা), 'তাযকিয়্যা'(পরিশুদ্ধিবিষয়ক জ্ঞান) ও 'এহসান' (পূর্ণতাপ্রাপ্ত চরিত্র সংক্রান্ত শাস্ত্র) নামে জ্ঞাত ছিল। এই 'যুহদ', 'তাযকিয়্যাহ' ও 'এহসান' শব্দগুলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে এগুলোকে 'এলম আল-হাদীস', 'এলম আল-কালাম', 'এলম আন-নাহু', 'এলম আল-তাসাউফ'-সহ অন্যান্য ইসলামী বিদ্যার মতোই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জমানায় যা যা করেছেন, বলেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন, তার ওপর ভিত্তি করেই এসব বিদ্যাশাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করা হয় এবং এগুলোর বিদ্যালয়-ও প্রতিষ্ঠা করা হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ'র পরবর্তী যুগে ইসলামী বিদ্যা চালুর প্রয়োজনীয়তা

আমরা দেখতে পাই যে হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জমানায় 'এলম আন্ নাহু' এমন কি কোনো শিশুকেও শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন পড়েনি। কেননা, হেজায অঞ্চলে বেড়ে ওঠে তাঁদের স্বাভাবিক অবস্থায় ('ফিতরা') এমন কি একজন শিশুও 'তাশকিল' (লেখা বা মুদ্রণে ব্যবহৃত বিশেষ চিহ্ন যা দ্বারা কোনো বর্ণের বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়) ছাড়াই কবিতা বা আরবী লিপি পড়তে পারতো। বেড়ে ওঠার সময় জানা থাকার কারণে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়ই আরবীয় সর্বসাধারণ এটি রপ্ত করতে সক্ষম হতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অনারব মানুষ যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা আরম্ভ করেন, তখন তাঁরা কুরআন মজীদ ভুলভাবে পাঠ করতে থাকেন। এমতাবস্থায় পবিত্র গ্রন্থের শুদ্ধ পঠনে সহায়তার জন্যে নতুন নিয়মকানুন প্রবর্তন জরুরি হয়ে পড়ে। এভাবেই 'এলম আন্ নাহু' ও 'এলম আত্ তাশকিল' প্রতিষ্ঠা পায়।

অনুরূপভাবে, 'এহসান' (পূর্ণতাপ্রাপ্ত) অবস্থা, 'যুহদ' (কৃচ্ছ্রব্রত) অবস্থা, 'ওয়ারা' (খোদাভীতি) অবস্থা এবং 'তাকওয়া' (খোদাসম্পর্কিত সচেতনতা) অবস্থাও সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম কর্তৃক স্বাভাবিকভাবে অনুশীলিত হয়েছিল; কেননা তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবতে তথা সান্নিধ্যে, আর ওই সব অবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল ওই সোহবতের সরাসরি ফলাফলস্বরূপ। এ কারণেই তাঁদেরকে 'সাহাবা' বলা হতো; কেননা

তাঁরা ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গি-সাথী এবং তাঁর ওই সঙ্গ-ই তাঁদেরকে পরিশুদ্ধ হতে সহায়তা করেছিল।

একইভাবে সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম-এর যুগের পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুমের সোহবত না পাওয়া বহু অপবিত্র মানুষ ইসলাম ধর্মগ্রহণ করার দরুন এবং ওই সময় অনেক নব্য মুসলিমের দ্বারা প্রকৃত ইসলাম ধর্মের পথ পরিত্যাগের কারণে একটি বিদ্যালয় তার ভিত্তিসহ প্রতিষ্ঠা করা জরুরি হয়ে পড়ে, ঠিক যেমনিভাবে 'এলম আন্ নাহু' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এ রকম বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, যেগুলোর মাধ্যমে 'এলম আত্ তাকওয়া', 'এলম আল-ওয়ারা', 'এলম আল-এহসান', 'এলম আয্ যুহদ' শাস্ত্রগুলোর উৎপত্তি ঘটে; আর এসব বিষয়কে 'এলম আত্ তাসাউফ' (তাসাউফ-বিষয়ক জ্ঞান) শীর্ষক শাস্ত্রের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

কোনো জ্ঞানের শাখার নামকরণে যে কোনো শব্দ প্রয়োগের ব্যাপারটি গৃহীত ও সর্বজনবিদিত; উপরন্তু, এ ব্যাপারে কারোর ইচ্ছানুযায়ী নামকরণে কোনো বাধা-ই নেই। অনুরূপভাবে, 'এলম আল-এহসান' শাস্ত্রটি-ও ভিন্ন কোনো নামকরণে পরিবর্তিত হয়ে যায় না। আমি যা মনেপ্রাণে চাই তা হলো, 'তাসাউফ' শব্দটির প্রতি অপছন্দ থাকার কারণে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত এই গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যা চর্চা করার ক্ষেত্রে যেন কাউকে বাধা দেয়া না হয়। কারো কাছে শব্দটি সমস্যা মনে হলে তিনি যেন সেটিকে নতুন কোনো নাম দেন, তার পছন্দের যে কোনো নাম যেন তিনি দেন।

আমাদের অবশ্যই জানা থাকা প্রয়োজন যে 'তাসাউফ' আমাদের ইসলাম ধর্মে নতুন কোনো বিষয় নয়, নতুন প্রবর্তিত বিষয়-ও নয়। বরঞ্চ এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি বিষয়, যার ভিত্তি ইসলাম ধর্মেই নিহিত রয়েছে। কতিপয় ইসলাম ধর্মের দুশমন প্রাচ্যবিশারদ ও তাদের শিষ্যরা এটি সম্পর্কে যা বলেছিল, এটি মোটেও তা নয়। তারা তাসাউফের জন্যে কিছু নতুন নামের উদ্ভাবন করেছিল যাতে তারা এ বিদ্যাশাস্ত্রকে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পবিত্র হাদীস শরীফে উল্লেখিত 'এহসান' অবস্থাকে আক্রমণ করতে পারে। তারা 'তাসাউফ' শাস্ত্রের প্রতি 'শাওওয়াযা' তথা কুসংস্কার শব্দটি আরোপ করার অপচেষ্টাও চালিয়েছিল।

'তাসাউফ' শব্দের ধাতু

'তাসাউফ' শব্দের ধাতু চারটি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথমটির আরবী 'সাফা' শব্দ থেকে উৎপত্তি। এর অর্থ প্রাকৃতিক উপাদান স্ফটিকের মতো নির্মল; পানির মতো স্বচ্ছ। কোনো স্বচ্ছ, পুতঃপবিত্র ও নির্মল অন্তরের বেলায় এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

এ রকম আরও অনেক ব্যাখ্যা 'তাসাউফ' শব্দটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন একটির উৎপত্তি হয়েছে 'আহলুস্ সুফফা' (মসজিদে নববী-সংলগ্ন ছোট বারান্দার মানুষজন) শব্দটি থেকে; এই পুণ্যাত্মাবৃন্দ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রকাশ্য হায়াতে জিন্দেগীর সময় মসজিদে নববী-সংলগ্ন বারান্দায় অবস্থান করতেন এবং তাঁদের সম্পর্কে আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে:

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

–এবং (হে রাসূল) আপন আত্মাকে তাদেরই সাথে সম্বন্ধযুক্ত রাখুন, যাঁরা সকাল-সন্ধ্যায় আপন রব্ব (প্রতিপালক)-কে আহ্বান করেন, তাঁরই সন্তুষ্টি চান, এবং আপনার চক্ষুদ্বয় যেন তাঁদেরকে ছেড়ে অন্য কারো দিকে না ফিরে; আপনি কি পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য কামনা করবেন? এবং তার কথা মানবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী

করে দিয়েছি এবং সে আপন খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেছে; আর তার কার্যকলাপ সীমাতিক্রম করে গিয়েছে।[৯]

ঈমানদার মুসলমানবৃন্দ কতোখানি নিজেদের জিহ্বা, মস্তিষ্ক ও অন্তর দ্বারা যিকিরের তথা আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার অবস্থায় থাকবেন, তার প্রতি ওপরে উদ্ধৃত আয়াতটি গুরুত্বারোপ করেছে।

তৃতীয় ধাতুটির উৎপত্তি আরবী 'আস্ সিফফা' শব্দটি হতে, যার মানে হলো সৎ স্বভাব ধারণ ও অসৎ স্বভাব বর্জনের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া।

চতুর্থ ধাতুটির উৎপত্তি আরবী 'সূফফাতুল কাফফা' শব্দটি হতে, যার অর্থ 'একটি নরম স্পন্জ'। কেননা, এ শব্দের বিশেষ্য 'সূফী' হচ্ছেন স্পন্জের মতোই নরম; তাঁর অন্তর নির্মল হওয়ার কারণে অত্যন্ত নরম। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম-এর প্রতি এতোখানি যত্নবান ছিলেন, যাতে তাঁদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা যায়; অধিকন্তু, তিনি তাঁদেরকে এ বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে প্রত্যেকের নিজ নিজ সত্তার উন্নতি নির্ভর করে অন্তরের উন্নতির ওপর এবং সেটির অভ্যন্তরীণ ও বহির্ভাগের সকল ব্যাধি হতে আরোগ্যের ওপরও।

রাসূলুল্লাহ ﷺ'র অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ

ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে:

وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ.

–নিশ্চয় (মানুষের) শরীরে এক টুকরো গোস্ত আছে, যেটি পবিত্র হলে সারা শরীর পবিত্রতা অর্জন করে; আর তা অপবিত্র হলে সারা শরীর অপবিত্রতা লাভ করে; নিশ্চয় শরীরের সে অংশটি হচ্ছে হৃদয় (অন্তর)।[১০]

[৯]. আল কুর'আন : আল কাহাফ ১৮/২৮।
[১০]. বুখারী : আস সহীহ, ১/২০ হাদীস নং ৫২।
(ক) মুসলিম : আস সহীহ, ৩/১২১৯ হাদীস নং ১৫৯৯।
(খ) ইব্ন মাজাহ : আস সুনান, ২/১৩১৮ হাদীস নং ৩৯৮৪।
(গ) আহমদ : আল মুস্নাদ, ৪/২৭০ হাদীস নং ১৮৩৯৮।
(ঘ) দারেমী : আস সুনান, ৩/১৬৪৭ হাদীস নং ২৫৭৩।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী মুসলিম শরীফের আল-বির্র অধ্যায়েও উদ্ধৃত হয়েছে; তিনি এরশাদ ফরমান:

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ.

–নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের শরীর বা চেহারার দিকে দেখেন না, বরং তোমাদের অন্তরের দিকেই দেখেন।[১১]

অতএব, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব কিছুকে অন্তরের পবিত্রতার সাথে বেঁধে দিয়েছেন। মন্দ স্বভাব ও আচরণ ত্যাগ করে আমরা যখন অন্তরকে সৎ স্বভাব ও সুন্দর আচরণ দ্বারা সুশোভিত করতে সক্ষম হবো, তখনই আমরা নিখুঁত ও স্বাস্থ্যকর অন্তর অর্জন করতে পারবো। আল্লাহ তা'আলা তা-ই উল্লেখ করেছেন তাঁর কুরআন মজীদে; তিনি এরশাদ ফরমান:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

–ওই দিন (শেষ বিচার দিবসে) না ধনসম্পদ, না পুত্র সন্তানসন্ততি কারো উপকারে আসবে; শুধু (উপকার হবে) সে ব্যক্তির, যিনি প্রশান্ত অন্তর নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবেন।[১২]

ইমাম সৈয়ুতী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "অন্তরের বিদ্যা ('আত্ তাসাউফ') অর্জন এবং হিংসা-বিদ্বেষ, অহঙ্কার ও দম্ভের মতো অন্তরের সমস্ত ব্যাধি সম্পর্কে জানা ও সেগুলো বর্জন প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি অবশ্য কর্তব্য।"

মোফাসসেরীন-বৃন্দ বলেন হিংসা ('হাসাদ'), প্রদর্শনী ('আর-রিয়া'), কপটতা ('আন্ নিফাক') ও ঘৃণা ('আল-হিকদ্') হচ্ছে সেসব মন্দ

(ঙ) ইব্ন আবী শায়বা : ৪/৪৪৮ হাদীস নং ২২০০৩।
(চ) ত্বরানী : আল মু'জামুল কাবীর, ২১/৬৪।
[১১]. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু তাহরীমি জুলমিল মুসলিম, ৪/১৯৮৬ হাদীস নং ২৫৬৪।
[১২]. আল কুর'আন : আশ শু'য়ারা, ২৬/৮৮।

স্বভাব ও আচরণ যা আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন তাঁর পাক কালামে; তিনি এরশাদ ফরমান:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

–হে রাসূল বলুন, নিশ্চয় আমার প্রভু (আল্লাহ তা'আলা) হারাম করেছেন সমস্ত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য লজ্জাজনক মন্দ কাজ (আল-ফাওয়াহিশা)।[১৩]

আয়াতোল্লিখিত 'আল-ফাওয়াহিশা' দ্বারা বোঝানো হয়েছে ঘৃণা (হিকদ্), হিংসা, বিদ্বেষ ও কপটতাকে। আর আয়াতোক্ত 'প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য' বাক্যটি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়ের দলীল উপস্থাপন করেছেন যে, শুধু বাহ্যিক আমল তথা কর্ম সংশোধন-ই নয়, বরং প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তস্থিত হৃদয়ে লুকানো অপবিত্রতা-ও পরিশুদ্ধ করা প্রয়োজন, যে অশুচিতা সম্পর্কে কেবল তার প্রভু আল্লাহ তা'আলা-ই ভালো জানেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম শরীফের 'কিতাবুল ঈমান' অধ্যায়ে বর্ণিত এক হাদীসে এরশাদ ফরমান:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.

–যে ব্যক্তির অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার বিদ্যমান, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১৪]

'তাসাউফ' হচ্ছে এমন এক বিদ্যাশাস্ত্র ও জ্ঞানের শাখা যা দ্বারা কেউ 'নফস্' তথা নিজ একগুঁয়ে সত্তার মন্দ স্বভাব ও আচরণ পরিশুদ্ধ করতে শেখে; এই মন্দ দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে হিংসা, প্রতারণা, প্রদর্শনী, প্রশংসার মুখাপেক্ষিতা, অহঙ্কার, দম্ভ, রাগ, লোভ, কৃপণতা, ধনীর প্রতি সম্মান ও গরিবের প্রতি অবহেলা। প্রত্যেকের বহিরঙ্গের পবিত্রতা অর্জনের মতো এগুলো থেকেও আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন করা একান্ত আবশ্যক। 'তাসাউফ'-শাস্ত্র সবাইকে নিজের সত্তার দিকে লক্ষ্য করতে এবং পবিত্র কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ

[১৩]. আল কুর'আন : আল আ'রাফ, ৭/৩৩।
[১৪]. মুসলিম : বাবু তাহরিমিল কিবার ওয়া বয়ানিহি, ১/৯৩ হাদীস নং ৯১।

অনুযায়ী আত্মপরিশুদ্ধি অর্জন করতে শিক্ষা দেয়; আর নিখুঁত গুণাবলী ('আস্ সিফাতুল কামেলাহ') দ্বারা নিজ চরিত্রকে সুশোভিত করতেও শেখায়। .এসব গুণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অনুশোচনা ('তওবা'), আল্লাহ তা'আলা-সম্পর্কিত সচেতনতা ('তাকওয়া'), সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ('এস্তেকামা'), সত্যবাদিতা ('সিদক'), নিষ্ঠা ('এখলাস'), মন্দ পরিহার ('যুহদ'), পুতঃপবিত্রতা ('ওয়ারা'), আল্লাহর প্রতি ভরসা ('তাওয়াককুল'), খোদায়ী বিধির প্রতি সন্তুষ্টি ('আর-রিদা'), আল্লাহর প্রতি সমর্পিত থাকা ('আত্ তাসলীম'), শিষ্টাচার ('আল-আদব'), প্রেম-ভালোবাসা ('মোহাব্বাত'), স্মরণ ('যিকর'), লক্ষ্য রাখা ('মোরাকাবা') এবং এ রকম আরও অনেক, অনেক গুণ যা সংখ্যাধিক্যের কারণে এখানে বিস্তারিত উল্লেখ করা যাচ্ছে না।

অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই জবাবনামার ভূমিকায় উল্লেখিত হাদীস-শাস্ত্রের যেমন ৩৫টি শ্রেণীবিন্যাস বিদ্যমান, তেমনি 'তাসাউফ'-শাস্ত্রেরও অসংখ্য শ্রেণীবিন্যাস বিদ্যমান; যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত দুটো শ্রেণীকরণ 'এহসান' অবস্থা অর্জন তথা উত্তম 'মোহসিন' কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ঈমানদারদের দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে গড়ে তোলা সৎ গুণাবলী ('আখলাকান হাসানা') এবং বাধ্যতামূলকভাবে বর্জনীয় মন্দ স্বভাব ('আখলাক এয-যামীমা')।

এখানেই আমরা 'তাসাউফ'-শাস্ত্রের গুরুত্ব ও এর উপকারিতা বা সুফল দেখতে পাই। এটি আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট করে ইসলামের আত্মা তথা মর্ম ও প্রাণস্পন্দন ('রূহ আল-ইসলাম ওয়া কালবাহু আন্ নাবিদ')। দ্বীন ইসলাম শুধু কোনো বাহ্যিক অনুশীলনী নয়, বরং এর একটি অন্তঃস্থিত জীবন বিরাজমান; যেমনটি আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন: "পাপের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিকগুলো পরিত্যাগ করো।"

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে আরও এরশাদ ফরমান:

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

–মুসলমানদের মধ্যে কিছু এমন পুরুষ রয়েছেন, যাঁরা সত্য প্রমাণ করেছেন যে-ই অঙ্গীকার তাঁরা আল্লাহর সাথে করেছিলেন।[১৫]

লক্ষণীয় যে, সকল ঈমানদার কিন্তু 'আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার পূরণকারী' এই মনোনীত দলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নন। এর মানে হলো, কোনো মুসলমান ঈমানদার হতে পারেন, কিন্তু 'আন্ নাফস্ আয্ যাকিয়্যা' তথা আত্মপরিশুদ্ধি এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হাদীসে উল্লেখিত 'এহসান' অবস্থা অর্জন না করা পর্যন্ত তিনি ওই 'আল্লাহর সাথে ওয়াদা পূরণকারী'দের দলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না। ইতিপূর্বে আমরা যে কথা বারবার বলেছি, এটি-ই পরবর্তীকালে 'তাসাউফ'-বিদ্যা নামে সুপরিচিত হয়ে যায়।

'তাসাউফ' শব্দটি সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া মন্তব্য

ইবনে তাইমিয়্যা 'তাসাউফের' সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যা বলেছে, তা উদ্ধৃত করার অনুমতি এবার আপনারা আমাদের দিন। ইবনে তাইমিয়া বলে:

"আল-হামদু লিল্লাহ! 'তাসাউফ' শব্দটির উচ্চারণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে শুধু ইমামমণ্ডলী ও মাশায়েখবৃন্দ-ই কথা বলেননি, বরং এতে আরও অন্তর্ভুক্ত আছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহি আলাইহি, শায়খ আবূ সোলাইমান দারানী রহমতুল্লাহি আলাইহি, সর্ব-হযরত সিররী সাকাতী রহমতুল্লাহি আলাইহি, জুনায়দ বাগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি, মারুফ কারখী রহমতুল্লাহি আলাইহি, আবদুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি, বায়েযীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং আরও অনেকে। এটি এমন-ই এক শব্দ/পদ যা ওই জ্ঞানের শাখা ['তাযকিয়্যাত আন্ নাফস্ এবং এহসান'] নিয়ে ব্যাপৃত মনীষীবৃন্দকে দেয়া হয়েছিল। আর এটি তেমন-ই একটি শব্দ যখন কেউ এভাবে বলে, 'কোরায়শী পরিবার হতে'; কিংবা বলে, 'মাদানী জনগোষ্ঠী হতে'; অথবা বলে, 'হাশেমী পরিবার হতে'। এটি একটি পরম্পরা ('নসব') যেমনটি আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরসূরীদের বেলায় বলি হাশেমী, কিম্বা তাঁর গোত্র সম্পর্কে বলি কোরায়শী, অথবা তাঁর শহরের

[১৫]. আল কুর'আন : আল আহযাব, ৩৩/২৩।

অধিবাসীদের বলি মাদানী; ঠিক তেমনি ওই বিদ্যার সাথে সম্পর্কিত (মহা)-জ্ঞানীদের সম্পর্ক ('নিসবাতান') ইঙ্গিত করার জন্যেই তাঁদেরকে আমরা সূফী বলে থাকি।"

ইবনে তাইমিয়্যা আরও বলে: "সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামা ('জামহূর আল-উলামা') এই বিদ্যাকে অস্বীকার করেননি, যেহেতু এটি শরীয়ত ও সুন্নাহ মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত; আর তাঁরা এটিকে সমর্থন-ও করেছেন।"

ইবনে তাইমিয়্যা এরপর বলে: "তাসাউফের রয়েছে বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার বিভিন্ন অবস্থা যা সূফীবৃন্দ তাঁদের বিদ্যাশাস্ত্রে আলোচনা করেন। এর কিছুটা হলো এই যে, সূফী/বোযর্গ তিনি-ই যিনি নিজেকে সেসব বিষয় থেকে পরিশুদ্ধ করেন যেগুলো তাঁকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং যিনি অন্তরের জ্ঞান (মানে আধ্যাত্মিকতা) ও মস্তিষ্কের জ্ঞান দ্বারা এমন-ই পরিপূর্ণ যে তাঁর কাছে স্বর্ণ ও পাথরের মূল্য একই। আর 'তাসাউফ' মূল্যবান অর্থগুলোকে সুরক্ষিত রাখে এবং যশ-খ্যাতির মোহ ও আত্মশ্লাঘা পরিত্যাগ করে, যাতে সত্যবাদিতার পর্যায়ে পৌঁছানো যায়; কেননা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামমণ্ডলীর পরে মনুষ্যকুল-সেরা হলেন সিদ্দিকীন, যেমনটি মহান আল্লাহ পাক নিচের আয়াতে করীমায় এরশাদ ফরমান:

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

–এবং যে (ব্যক্তি) আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মানে, তবে সে তাঁদেরই সঙ্গ লাভ করবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, সিদ্দীকবৃন্দ (সত্যনিষ্ঠ বান্দাগণ), শহীদান এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিবৃন্দ। এঁরা কতোই উত্তম সঙ্গি![১৬]

[১৬]. আল কুর'আন : সূরা নিসা, ৪/৬৯; মুফতী আহমদ এয়ার খান কৃত 'নূরুল এরফান'।

ইবনে তাইমিয়্যা আরও বলে, "আর বাস্তবিকভাবে সূফী হলেন এক ধরনের সিদ্দীক (সত্যপন্থী), যিনি যুহদ ও এবাদত-বন্দেগীতে বিশেষজ্ঞ হয়েছেন।"

ইবনে তাইমিয়্যা আরও বলে, "কিছু লোক সূফিয়্যা ও 'তাসাউফের' সমালোচনা করেছে এই বলে যে তাঁরা বেদআতী; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত। কিন্তু সত্য হলো, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে ('মোজতাহিদীন ফী তা'আতিল্লাহ') সাধনারত, ঠিক যেমনিভাবে অন্যান্য আল্লাহ-ওয়ালা আল্লাহর আনুগত্যে ছিলেন সাধনারত। অতএব, তাঁদের মধ্য হতে নিজ সাধনাবলে ('আস্ সাবিকুল মোকাররাব বি হাসাবে এজতেহাদিহী') খোদায়ী নৈকট্যে সর্বাধিক অগ্রসর জনের দেখা আপনারা পাবেন। আর তাঁদের কেউ কেউ ডান হাতের দিকের মানুষ [সূরা ওয়াকে'য়াহ-তে বর্ণিত 'আহলুল এয়ামীন'], তবে (আধ্যাত্মিক) উন্নতিতে অপেক্ষাকৃত ধীরগতিসম্পন্ন। উভয় শ্রেণীর বেলাতেই তাঁরা হয়তো এজতেহাদ প্রয়োগ করতে পারেন; তবে সেক্ষেত্রে তাঁরা সঠিকও হতে পারেন, আবার ভুলও করতে পারেন। আর উভয় শ্রেণীর পুণ্যাত্মা-ই কোনো না কোনো (এজতেহাদী) ভুল করতে পারেন এবং তওবা-ও করতে পারেন। আর এটি-ই হলো তাসাউফের উৎস। এই উৎসের পরে এটি প্রসার লাভ করেছে এবং এর কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা ('তাশা'আবাত ওয়া তানাওয়া'আত') রয়েছে। এতে রয়েছে তিন কিসিম:

১/'সূফিয়্যাত-ইল-হাকায়েক', মানে প্রকৃত সূফী
২/'সূফিয়্যাত-ইল-আরযাক', মানে পেশাদার সূফী (ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষী সূফী)
৩/ 'সূফিয়্যাত-ইল-রসম', মানে বাহ্যিক আবরণে সূফী।"

আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দিল ওয়াহ্হাব-এর 'তাসাউফ' সম্পর্কে ভাষ্য

আমরা এখানে আপনাদের খেদমতে মুহাম্মদ মানযূর নোমানীর প্রণীত 'আদ্ দিয়া'আত মোকাশাফা দি'দ আশ্ শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দ আল-ওয়াহহাব' শীর্ষক পুস্তকের ৮৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ চিঠির উদ্ধৃতি দেবো, যেখানে বলা হয়, "শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দিল ওয়াহহাবের পুত্র

আব্দুল্লাহ 'তাসাউফ' সম্পর্কে বলে: 'আমি ও আমার পিতা সূফীতাত্ত্বিক জ্ঞান তথা তাসাউফ বিদ্যাশাস্ত্রকে অস্বীকার করি না, এর সমালোচনাও করি না, বরঞ্চ উল্টো একে সমর্থন করি। কেননা, এই জ্ঞান (আমাদের) যাহের (বাহ্যিক দিক)-কে সাফ করে এবং বাতেন (অভ্যন্তরীণ দিক)-কে অপ্রকাশ্য গুনাহ থেকে পরিশুদ্ধ করে; আর এগুলো অন্তর ও শিরা-উপশিরা এবং বাহ্যিক আকৃতির সাথে সম্পৃক্ত; যদিও কোনো ব্যক্তি বাহ্যতঃ সঠিক পথে থাকে, তবুও সে হয়তো ভেতরে (মানে অন্তরে) ভুল পথের পথিক হতে পারে। আর এ কারণেই তাসাউফের প্রয়োজন। কিন্তু আমরা আশা করি না এবং পছন্দ-ও করি না কেউ কেউ 'তাসাউফের' নাম ব্যবহার করে অচেতন অবস্থায় কথা বলুক।"

আমরা এখানেই ক্ষান্ত দিতে চাই। কেননা, এই বর্ণনা আমাদের পাঠকদের জন্যে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে, আর আমাদের হাতে সময়ও সীমিত। আমরা যেহেতু বলেছিলাম আমাদের ব্যাখ্যা দিতে সময় দরকার, সেহেতু কিছু মানুষ বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ার অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেন। উপরন্তু, এ বিষয়ে যা বলা যেতো, সমুদ্রের এক বিন্দু পরিমাণ-ই কেবল আমরা এখানে বলেছি। তাও আবার প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই তা বলা হয়েছে!

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর

আপনি (শায়খ আদলী) প্রথম প্রশ্নে দেখেছেন আমরা সংক্ষেপে তার উত্তর দিয়েছি। আর আপনি সযত্নে আমাদের প্রথম উত্তরটি পড়লে দেখতে পাবেন যে আমরা আপনার অন্য পাঁচটি প্রশ্নের উত্তরও সেখানে ইতোমধ্যেই দিয়ে ফেলেছি।

আপনি প্রশ্ন করেছিলেন:
২/ তাসাউফ সম্পর্কে আল-কুরআনে কোনো প্রামাণ্য দলিল আছে কি? যদি থাকে, তবে অনুগ্রহ করে খোলাসা করবেন কি?

আল্লাহ তা'আলা 'তাযকিয়্যাত আন্ নাফস'কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি কর্তব্য বলে বর্ণনা করেন।

আল-কুরআনে আলোকে 'তাসাউফ'

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

–তিনি-ই, যিনি উম্মী (মক্কাবাসী) লোকদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেন যেন তাদের কাছে তাঁর (খোদার) আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন (ওয়া ইউযাক্কীহিম) এবং তাদেরকে কেতাব ও হেকমতের জ্ঞান দান করেন; আর অবশ্যঅবশ্য তারা ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলো।[১৭]

'ওয়া ইউযাক্কীহিম' বাক্যটি আমরা ওপরে ব্যাখ্যা করেছি এবং ইতিপূর্বেকার ভূমিকায়ও আলোকপাত করেছি।

আল্লাহ পাক অন্যত্র এরশাদ ফরমান:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾

–এবং (শপথ) আত্মার এবং তাঁরই যিনি তাকে সুঠাম করেছেন; অতঃপর তার অসৎকর্ম ও তার খোদাভীরুতা অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছেন; নিশ্চয় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে (সে-ই), যে (ব্যক্তি) সেটিকে পবিত্র করেছে; এবং নিরাশ হয়েছে সে, যে (ব্যক্তি) সেটিকে পাপের মধ্যে আচ্ছন্ন করেছে।[১৮]

আমরা এখানে আল-কুরআনের এমন একখানি আয়াত দেখতে পাই, যা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সফল হবার জন্যে নফস্ (কুপ্রবৃত্তি)-কে পরিশুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি তাকিদ দেয়।

[১৭]. আল কুর'আন : আল জুমু'আ, ৬২/২ আয়াত; মুফতী আহমদ এয়ার খান কৃত 'তাফসীরে নূরুল এরফান'।
[১৮]. আল কুর'আন : সূরা শামস্, ৯১/৭-১০।

পবিত্র কুরআনে ঈমানদারদেরকে 'সাদেকীন'দের সাথী হওয়ার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

–হে ঈমানদার মুসলমানবর্গ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সাদেকীন তথা সত্যবাদীদের সাথে থাকো।[১৯]

এখানে উল্লেখিত 'সাদেকীন'-বৃন্দ হচ্ছেন সেসব পুণ্যাত্মা, যাঁদেরকে ওপরে প্রদত্ত ইবনে তাইমিয়্যার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার প্রিয়ভাজন ও সান্নিধ্যপ্রাপ্ত 'সাদেকীন'বৃন্দের সঙ্গি হওয়া এবং তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার প্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মানকারী ওপরোক্ত আয়াতে করীমাটি হচ্ছে এতদসংক্রান্ত একটি দলিল। এই 'সাদেকীন'বৃন্দ হলেন সর্বোচ্চ স্তরের আউলিয়া, যাঁদের সম্পর্কে আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে:

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

–শোনো! নিশ্চয় আল্লাহর আউলিয়া (বন্ধু)-দের না কোনো ভয় আছে, না কোনো দুঃখ।[২০]

সাদেকীনবৃন্দ হলেন সে সকল পুণ্যাত্মা যাঁরা ঈমানদারিতে সর্বোচ্চ মকাম তথা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে আরও বলা হয়েছে:

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

–মুসলমানদের মধ্যে কিছু এমন পুরুষ রয়েছেন, যাঁরা সত্য প্রমাণিত করেছেন যে-ই অঙ্গীকার তাঁরা আল্লাহর সাথে করেছিলেন; সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপন মান্নত পূর্ণ

[১৯]. আল কুর'আন : তওবা, ৯/১১৯।
[২০]. আল কুর'আন : ইউনূস, ১০/৬২।

করেছেন, এবং কেউ কেউ অপেক্ষা করছেন। আর তাঁরা সামান্যটুকু-ও পরিবর্তিত হননি।[২১]

এ আয়াতে বোঝা যায় যে প্রতিটি যুগেই এমন কিছু পুণ্যাত্মা থাকবেন যাঁরা আল্লাহর ওয়াদা পূরণে হবেন বদ্ধ পরিকর।

আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি জ্ঞানপ্রাপ্ত একজন সম্পর্কে মহান প্রভু স্বয়ং যা বর্ণনা করেন–

হযরত মূসা নবী আলাইহিস সালাম যখন হযরত খিযির আলাইহিস সালাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, সেই ঘটনা বর্ণনাকারী কিছু আয়াতে করীমার উদ্ধৃতি আমরা এক্ষণে দেবো। আল্লাহ তা'আলা এটি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেন:

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ ءَاتَيْنَٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

–অতঃপর তারা আমার বান্দাদের থেকে একজন বান্দাকে পেলো, যাকে আমি আমার কাছ থেকে অনুগ্রহ দান করেছি এবং তাকে আপন 'এলমে লাদুন্নী' দান করেছি। তাকে মূসা বললো, 'আমি কি তোমার সাথে থাকবো এ শর্তে যে তুমি আমাকে শিক্ষা দেবে ভালো কথা, যা তোমাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে?' (ওই বান্দা) বললো, 'আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না'।[২২]

ওপরে উল্লেখিত আয়াতগুলোতে পরিস্ফুট হয় যে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবী ও মহান প্রভুর সাথে একমাত্র সরাসরি কথপোকথনকারী (কালিমুল্লাহ) হওয়া সত্ত্বেও হযরত খিযির আলাইহিস সালাম-এর এমন জ্ঞান ছিল, যা মূসা আলাইহিস সালাম-এর ছিল না; আর তিনি হযরত খিযির আলাইহিস সালাম-এর কাছে সেই জ্ঞান

[২১]. আল কুর'আন : আল আহযাব, ৩৩/২৩ 'নূরুল এরফান'।
[২২]. আল কুর'আন : আল কাহাফ, ১৮/৬৫-৬৬ মুফতী আহমদ এয়ার খান নঈমী আশরাফী কৃত তাফসীরে নূরুল এরফান।

অন্বেষণ করেছিলেন। কেননা হযরত খিযির আলাইহিস সালাম সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে ওই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا।[২৩] অধিকন্তু, তিনি ছিলেন আল্লাহর আউলিয়া (বন্ধু)-দের একজন, যেমনটি ওপরের আয়াতে করীমায় বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াত ও ওপরে উক্ত অন্যান্য আয়াত থেকে পরিভাষাগত 'তাসাউফ'-শাস্ত্রে একজন 'শায়খ আত্ তারবিয়্যা' তথা পথপ্রদর্শককে অনুসরণের সমর্থনসূচক অনেক দলিলের একটি দলিল আমরা এখানে দেখতে পাই।

আল্লাহ পাকের 'মোহসেনীন'-কে সঠিক পথপ্রদর্শনের ওয়াদা

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ

–আর যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায়, অবশ্যই আমি তাদেরকে আপন রাস্তা দেখাবো; এবং নিশ্চয় আল্লাহ পাক মোহসেনীন তথা সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।[২৪]

অধিকাংশ মহান ইসলামী উলেমাবৃন্দ 'তাযকিয়্যাত আন্ নাফস্' চর্চা করেছেন এবং 'এহসান' অবস্থা অর্জনে সাধনা করেছেন। তাঁদের দ্বারাই মধ্য এশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, তুরস্ক, বসনিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, চীন, ইন্দো-চীন, স্পেন, পূর্ব ইউরোপ এবং আফ্রিকার বেশির ভাগ এলাকায় ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার হয়েছিল। 'তাসাউফ' চর্চাকারী এ সকল উলামা-এ-হক্কানী/রব্বানী নিজেদের 'যুহদ', 'ওয়ারা', 'তাকওয়া' ও 'তাযকিয়্যা' অবস্থা দ্বারা ওপরোক্ত রাজ্যগুলোতে ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছে দেন; কেননা তাঁদের এই গুণগুলো তাঁদেরই সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষজনের কাছে এতো আকর্ষণীয় ও আবেদনপূর্ণ ছিল যে সেসব মানুষ আপনাআপনি ইসলাম ধর্মের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন।

[২৩]. আল কুর'আন : আল কাহাফ, ১৮/৬৪।
[২৪]. আল কুর'আন : আল আনকা'বুত, ২৯/৬৯ নং আয়াত; প্রাগুক্ত 'নূরুল এরফান'।

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক উলামাবৃন্দের অন্তরের কথা উল্লেখ

আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান:

بَلْ هُوَ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٤٩﴾

–বরং ওটা সুস্পষ্ট নিদর্শন তাদের অন্তরের মধ্যে, যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে; এবং (কেউই) আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে না, কিন্তু অত্যাচারীরা (ব্যতিরেকে)।[২৫]

অন্যত্র তিনি এরশাদ ফরমান:

وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ۚ

–আর তারই পথে চলো, যে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে।[২৬]

আয়াতোল্লিখিত 'পথ'টি হচ্ছে সেসব প্রিয় বান্দার যাঁরা আল্লাহকে ভালোবাসেন।[২৭] এই হলো মহব্বতের অবস্থা যা আয়াতে করীমায় উল্লেখিত হয়েছে, আর সেটি অন্তরের সাথেই সম্পৃক্ত, মস্তিষ্কের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

আল্লাহ তাঁর নৈকট্য অন্বেষণের জন্যে মাধ্যম তালাশের করার নির্দেশ

আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَـٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

–হে ঈমানদার মুসলমানবৃন্দ! আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁরই দিকে মাধ্যম তালাশ করো এবং তাঁর পথে জ্বেহাদ করো এ আশায় যে সফলতা পেতে পারো।[২৮]

---

[২৫]. আল কুর'আন : আল আনকা'বুত, ২৯/৪৯।
[২৬]. আল কুর'আন : লুকমান, ৩১/১৫।
[২৭]. ইউসুফ আলীর তাফসীর; 'নূরুল এরফান' তাফসীর পুস্তকে আউলিয়ার কথা লেখা হয়েছে।
[২৮]. আল কুর'আন : আল মায়েদা, ৫/৩৫ মুফতী আহমদ এয়ার খান সাহেবের 'নূরুল এরফান।

এই আয়াতের অর্থ হলো, কেউ সাফল্যমণ্ডিত হতে চাইলে আল্লাহর রাস্তায় সাধনা করতে হবে এবং নিজের নফস্ তথা একগুঁয়ে সত্তার খামখেয়ালিপনা বা বদ-খায়েশাতের গোলামি করা যাবে না। আর ,এতে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসীলা অন্বেষণেরও তাকিদ রয়েছে।[২৯]

আল্লাহ তা'আলা 'তাযকিয়্যাত আন্ নাফস্' উল্লেখ করেন

আল্লাহ এরশাদ ফরমান:

رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ

–(হে আমাদের রব্ব! এবং তাদের মধ্যে তাদের থেকে) একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি আপনারই আয়াতসমূহ তাদের কাছে তেলাওয়াত করবেন এবং তাদেরকে আপনার কেতাব (আল-কুরআন) ও পরিপক্ক জ্ঞান শিক্ষা দেবেন; আর তাদেরকে অতি পবিত্র (তাযকিয়্যাত আন্ নাফস্) করবেন।[৩০]

অন্যত্র এরশাদ ফরমান:

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

–যেমন আমি তোমাদের মাঝে প্রেরণ করেছি একজন রাসূল তোমাদেরই মধ্য হতে, যিনি তোমাদের প্রতি আমার আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পবিত্র করেন

---

[২৯].অনুবাদকের নোট: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'ওয়ারিস' হিসেবে উলামায়ে হাক্কানী/রাব্বানী তথা আউলিয়া কেরাম-ও আয়াতোক্ত অসীলা। 'নূরুল এরফান' তাফসীর পুস্তকে লেখা আছে, "এ থেকে বোঝা গেল যে মুসলমানদের আমল তথা ধর্ম অনুশীলনের সাথে সাথে নবী আলাইহিস সালাম ও ওলী রহমতুল্লাহি আলাইহি-বৃন্দের অসীলা-ও তালাশ করা চাই। কেননা, আমলগুলোর কথা তো 'এত্তাকুল্লাহ' (আল্লাহকে ভয় করো) মর্মে আদেশের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর 'অসীলা' তালাশের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ কথা বোঝা গেল যে 'অসীলার' পথেও প্রচেষ্টা চালানো চাই, যাতে অসীলা অর্জিত হয়।
[৩০]. আল কুর'আন : আল বাক্বারা, ২/১২৯।

(তাসাউফের জ্ঞান দ্বারা) এবং কেতাব (আল-কুরআন) ও পরিপক্ক জ্ঞান শিক্ষা দেন।[৩১]

আল্লাহ পাক অন্যত্র আরও এরশাদ ফরমান:

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

–নিশ্চয় লক্ষ্যে পৌঁছেছে সে-ই, যে ব্যক্তি পবিত্র (তাযকিয়্যাত আন্ নাফস্) হয়েছে; আর আপন রব্বের নাম নিয়ে নামায পড়েছে।[৩২]

ওপরের আয়াতে করীমায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা 'মোতাসাউয়ীফ'বৃন্দের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করেছেন। এঁরা নিজেদেরকে পবিত্রকরণে সাধনারত; আর সর্বদা আপন আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাতের যিকিরে ব্যস্ত; আর নিজেদের নামায আদায়েও মনোযোগী।

আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ ফরমান:

وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِۦ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ

–এবং যে ব্যক্তি পবিত্র (তাযকিয়্যাত আন্ নাফস্) হয়েছে, তবে সে নিজেরই কল্যাণার্থে পবিত্র হয়েছে; আর আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[৩৩]

আমরা এখানে দেখতে পাই আত্মপরিশুদ্ধিমূলক বিদ্যাশাস্ত্র 'তাসাউফ'-এর সুগভীর নির্যাস। এক্ষণে আমাদের পাঠকদের আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এটি কেবল একটি পারিভাষিক শব্দ, যেটির স্থলে অন্য যে কোনো শব্দ-ও ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি-ই ইসলাম। ইসলাম ধর্ম অনুসরণের বা অনুশীলনের দাবিদার যে কাউকেই আত্মপরিশুদ্ধির এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে, যেহেতু ওপরে উল্লেখিত আয়াতগুলোতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে। নিশ্চয় এই

[৩১]. আল কুর'আন : আল বাক্বারা, ২/১৫১।
[৩২].আল কুর'আন : আল ৮৭/১৪-১৫ আয়াত; 'তাফসীরে নূরুল এরফান' পুস্তকে অন্তরের পবিত্রতা দ্বারা আদায়কৃত সালাত আউলিয়াদের বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
[৩৩]. আল কুর'আন : ফাতির ৩৫/১৮ 'তাফসীরু নূরুল এরফান'।

আত্মপরিশুদ্ধির সাধনা ব্যতিরেকে বিন্দু পরিমাণ ইসলামের (আল্লাহর প্রতি সমর্পণের) দাবি করাটা একেবারেই অনর্থক হবে। এই সাধনায় কেউ সফল হলো কি হলো না, তা এখানে প্রশ্ন নয়, বরং এটি যে প্রত্যেক মুসলমান নর অথবা নারীর জন্যে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তা-ই এখানে বিবেচ্য বিষয়।

আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান:

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ ﴿٣﴾ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰٓ ﴿٤﴾

–এবং আপনি কি জানেন? হয়তো সে পবিত্র (তাযকিয়্যাত আন্ নাফস্) হতো, কিংবা সে উপদেশ গ্রহণ করতো, অতঃপর তাকে উপদেশ উপকৃত করতো।[৩৪]

তিনি আরও এরশাদ ফরমান:

فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

–অতঃপর আমরা চাইলাম যে তাদের উভয়ের রব্ব তার চেয়ে উত্তম, পবিত্র ('যাকা'তান') এবং তার চেয়ে দয়ার মধ্যে অধিক নিকটতর (সন্তান) দান করবেন।[৩৫]

উপরন্তু, তিনি আরও এরশাদ ফরমান:

قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

–(জিবরীল) বললেন, 'আমি তো তোমার রব্বের প্রেরিত, আমি তোমাকে এক পবিত্র পুত্র (সন্তান) প্রদান করবো।[৩৬]

বি: দ্র: এখানে 'যাকিয়্যা' শব্দটি আবারও ব্যবহৃত হয়েছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-কে উদ্দেশ্য করে।

আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ

[৩৪]. আল কুর'আন : আবাসা, ৮০/৩-৪।
[৩৫]. আল কুর'আন : আল কাহাফ, ১৮/৮১।
[৩৬]. আল কুর'আন : মরিয়ম, ১৯/১৯।

–হে মাহবূব! তাদের (মো'মেন বান্দাদের) সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহ করুন, যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র (তাযকিয়্যা-এ-নফস্) করবেন এবং তাদের জন্যে মঙ্গল প্রার্থনা (দোয়া) করুন; নিশ্চয় আপনার দোয়া তাদের অন্তরগুলোর প্রশান্তি।[৩৭]

তিনি আরও এরশাদ ফরমান:

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا

وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

–আর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া তোমাদের প্রতি না থাকতো, তবে তোমাদের মধ্যে কেউই কখনো পবিত্র হতে পারতে না। হ্যাঁ, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র (তাযকিয়্যাত আন্ নাফস্) করে দেন এবং আল্লাহ শোনেন, জানেন।[৩৮]

আত্মপরিশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনাকারী কতিপয় আয়াতে করীমা ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে। আর আত্মপরিশুদ্ধি তথা 'তাযকিয়্যাত আন্ নাফস' হচ্ছে 'তাসাউফ'-শাস্ত্রের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলোর মধ্যে একটি।

'তাযকিয়্যা' শব্দের অভিধানিক অর্থ

আমরা অভিধানে 'তাযকিয়্যা' শব্দটির অর্থ খুঁজে দেখলে এর সকল অর্থে زَكِيْ মানে 'পবিত্র ছিল', يُزَكِّيْ মানে 'পবিত্রকরণ' ও 'পরিচ্ছন্ন করা'; এছাড়াও زَكَاةْ মানে 'পবিত্রকৃত'। تَزْكِيَةْ শব্দটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'পরিচ্ছন্ন করা বা পবিত্রকরণ' হিসেবে। يُزَكِّيْ মানে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রকৃত।

زَكَاةْ 'যাকা'তুন' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে"একটি ইসলামী কর-ব্যবস্থা যেটি গরিবদের প্রাপ্য; যেটি গরিবদেরই উদ্দেশ্যে দান-সদকাহ বটে।" কিন্তু এসব শব্দের কোনোটি-ই পরিপূর্ণ অর্থজ্ঞাপক নয়। তাই

[৩৭]. আল কুর'আন : আত তাওবা, ৯/১০৩।
[৩৮]. আল কুর'আন : নূর, ২৪/২১ 'তাফসীরে নূরুল এরফান'।

'পবিত্রতা' ও 'পুণ্যময় ধার্মিকতা' শব্দগুলোই এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত।

زَكِيَةْ 'আযকা'য়া' শব্দটির অনুবাদ হচ্ছে 'সবচেয়ে পবিত্র, নির্মল।' زَكِيْ 'যাকিয়্যাতান্' মানে 'নির্মল', 'নির্দোষ'।

ওপরের সংজ্ঞাগুলো লিপিবদ্ধ আছে 'লুগাতুল কুর'আন' শীর্ষক বইয়ের ২৪৩ পৃষ্ঠায়।

'এহসান' পূর্ণতাপ্রাপ্ত চারিত্রিক অবস্থাসম্পর্কিত কুরআনের আয়াত

আমরা ওপরে 'তাযকিয়্যাত আন্ নাফস্' তথা আত্মপরিশুদ্ধিমূলক বিদ্যাশাস্ত্র সম্পর্কে অনেকগুলো আয়াতে করীমা উপস্থাপন করেছি। এক্ষণে আমরা 'এহসান' তথা পূর্ণতাপ্রাপ্ত চারিত্রিক অবস্থাবিষয়ক কিছু আয়াতে করীমা পেশ করতে ইচ্ছুক। আমরা কিন্তু 'উম্মুল হাদীস' আল-বুখারী গ্রন্থে বর্ণিত হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর প্রশ্নসম্বলিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এতদসংক্রান্ত হাদীসটি এখনো উদ্ধৃত করিনি। 'এহসান' পবিত্র কুরআন মজীদের অনেক স্থানে উল্লেখিত হয়েছে, যেগুলো আমরা নিচে পেশ করছি। আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান:

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ "নিশ্চয় আল্লাহর দয়া মোহসেনীন (এহসান-কারী) বা সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।"[৩৯] এবং إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ "নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা (তাঁকে) ভয় করে এবং এহসান তথা সৎকর্ম করে।"[৪০] এবং هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ "এহসান তথা উত্তম কাজের প্রতিদান কী? শুধু উত্তম কাজ-ই।"[৪১] এবং وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى "আর (তিনি) মোহসেনীন তথা সৎকর্মপরায়ণদেরকে অত্যন্ত উত্তম প্রতিদান দেন।"[৪২] এবং إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ

[৩৯]. আল কুর'আন : আল আ'রাফ, ৭/৫৬ 'নূরুল এরফান'।
[৪০]. আল কুর'আন : আন নাহল, ১৬/১২৮।
[৪১]. আল কুর'আন : আর-রাহমান, ৫৫/৬০ 'নূরুল এরফান'।
[৪২]. আল কুর'আন : আন নজম, ৫৩/৩১ 'নূরুল এরফান'।

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ –"নিশ্চয় আল্লাহ নির্দেশ দেন ন্যায়বিচার, পুণ্য (এহসান) ও আত্মীয়স্বজনকে দান করার এবং নিষেধ করেন অশ্লীলতা, মন্দ কথা ও অবাধ্যতা থেকে; তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা ধ্যান করো।"[৪৩] এবং بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ –"হ্যাঁ, কেন (এমন) নয়? যে ব্যক্তি আপন চেহারা ঝুঁকিয়েছে আল্লাহর জন্যে এবং সে হয় মোহ্সেনীন তথা সৎকর্মপরায়ণ, তবে তার প্রতিদান তার রব্বের কাছে রয়েছে এবং তাদের না আছে কোনো শঙ্কা, আর না আছে কোনো দুঃখ।[৪৪] এবং وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ –"আর যে কেউ আপন মুখমণ্ডলকে আল্লাহর দিকে অবনত করে এবং হয় এহসান-কারী তথা সৎকর্মপরায়ণ, তবে সে নিশ্চয় এক মজবুত গ্রন্থি দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে এবং আল্লাহরই দিকে হচ্ছে সব কাজের শেষ পরিণতি।"[৪৫] এবং وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ –"আর ওই ব্যক্তি অপেক্ষা কার দ্বীন উত্তম, যে আপন চেহারা আল্লাহর জন্যে ঝুঁকিয়েছে এবং সে হয় মোহসিন তথা সৎকর্মপরায়ণ।"[৪৬]

'এহসান' ও তা হতে উৎপন্ন শব্দাবলীর আভিধানিক অর্থ

'এহসান' অবস্থা সম্পর্কে আল-কুরআনের এতো অগণিত আয়াতে করীমা বিদ্যমান যে আমরা যা উদ্ধৃত করেছি, তা-ই যথেষ্ট হবে। সামনে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে হাদীস উদ্ধৃত করতে যাচ্ছি তাতে তাঁর ব্যাখ্যাকৃত 'এহসানের' প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এমন পন্থায় আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী করা যার দরুন ওই এবাদতের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিকের বাস্তবতাকে পূর্ণতা দিতেই আপনি সাধনারত এবং সাফল্যমণ্ডিত হন। এ রকম একটি উদাহরণ হলো বিনয় ও সমর্পিত হয়ে ('খুযু' ও 'খুশু') সালাত বা নামায আদায়,

৪৩. আল কুর'আন : আন নাহল, ১৬/৯০।
৪৪. আল কুর'আন : আল বাক্বারা, ২/১১২।
৪৫. আল কুর'আন : লুক্বমান, ৩১/২২।
৪৬. আল কুর'আন : আন নিসা, ৪/১২৫।

(এমন প্রত্যয়ে) যেন আপনি আল্লাহ তা'আলাকে দেখছেন এবং তিনি যে আপনাকে দেখছেন সে সম্পর্কেও আপনি ওয়াকেফহাল আছেন।

অভিধানে আমরা দেখতে পাই (আরবী) 'এহসান' শব্দটি ও তা হতে উৎপন্ন শব্দাবলীর বহু অর্থ বিদ্যমান। সেগুলো নিম্নরূপ: 'হাসুনা', মানে 'উত্তম হওয়া', 'ভালো করা', 'ভালো মনে হওয়া', 'সুন্দর হওয়া' [এর মানে সৎ গুণাবলী দ্বারা নিজেকে সুশোভিত করা, বাহ্যিক (জিসমানী) ও অভ্যন্তরীণ (রুহানী) উভয় দিককেই উন্নত করা]। এ ছাড়াও অন্যান্য উৎপন্ন শব্দ হলো:

إِحْسَانًا 'এহসানান', যার মানে 'উত্তম (কর্ম) করা';
أَحْسَنُ 'আহসানু', মানে 'তারা উত্তম (কর্ম) করেছে';
أَحْسَنْتُمْ 'আহসানতুম', মানে 'তোমরা উত্তম (কর্ম) করেছো';
أَحْسِنْ 'আহসিন', মানে 'তুমি উত্তম (কর্ম) করো!'
أَحْسِنُ 'আহসিনূ', মানে 'তোমরা উত্তম (কর্ম) করো!'
إِحْسَانٌ 'এহসা'নুন', মানে 'দয়া';
حُسْنَى 'হুসনা', মানে 'পুরস্কার';
حِسَانٌ 'হিসানূন', মানে 'সুন্দর ব্যক্তিবৃন্দ'।

আমরা এখানে বিভিন্ন অর্থ পাচ্ছি। এটি যখন সিফাত (বিশেষণ) হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন এর মানে দাঁড়ায় দয়া এবং একটি অভ্যন্তরীণ (অন্তরের) মনোভাব ও আত্মসম্বরণ।

অতএব, আল-কুরআনে উল্লেখিত 'এহসান' একটি অতি উচ্চ অবস্থা, যাকে হযরত জিবরীল আমীন আলাইহিস সালাম দ্বীনের অন্তর্নিহিত অংশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং যাকে তিনি ইসলাম ও ঈমান অবস্থাগুলোর সমপর্যায়েই স্থাপন করেছেন। দ্বীন/ধর্ম তিনটি অবস্থার সমষ্টি: ইসলাম, ঈমান ও এহসান; এগুলোর প্রতিটিরই নিজ নিজ পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা রয়েছে। এ কারণেই কুরআন মজীদের এতোগুলো স্থানে 'এহসান' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম কর্তৃক জিজ্ঞাসিত

হওয়ার পরে ইসলাম ও ঈমানের মতোই সমান গুরুত্ব এটিকে দিয়েছেন।

এটি-ই হলো 'তাসাউফ' বিদ্যাশাস্ত্রের সারমর্ম। আপনার পছন্দ না হলে শব্দটি পরিবর্তন করতে পারেন, কিন্তু আমরা এ শব্দটি পছন্দ করি; কেননা এটি সর্বজনবিদিত ও বহুল প্রচলিত। আরবীতে আমরা বলি مُصْطَلَاتٌ لَا تُلْغِ الاَحْكَامَ وَالْحَقَائِقْ "মোস্তালাহহাত লা তালগি আল-আহকাম ওয়াল হাকায়েক", যার অর্থ "কোনো বিষয়ের মৌলিক প্রকৃতি বা বাস্তবতা শব্দাবলী পরিবর্তন সাধন করে না।" আরেক কথায়, "গোলাপ ফুলকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন তা সুগন্ধ ছড়াবেই।"

আমরা এভাবে আরও অনেক আয়াতে করীমা উদ্ধৃত করতে পারি, কিন্তু যেহেতু এই জবাবকে আমরা দীর্ঘ করতে চাই না সেহেতু এক্ষণে আমরা ক্ষান্ত দেবো। হয়তো পরবর্তী কোনো সময়ে এ বিষয়ে আরও আলোকপাত করা যাবে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর
'তাসাউফ' সম্পর্কে হাদীসের দলিলগুলো কী কী?

আমাদের সম্মানিত দ্বীনী ভাই শায়খ মুহাম্মদ আদলীর তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল:

৩. 'তাসাউফ' ও তার অনুশীলনের পক্ষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহাদীস হতে কোনো দলিল-আদিল্লা আছে কি? থাকলে অনুগ্রহ করে সেগুলোর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করুন এবং বিস্তারিত বিবরণ দিন।

জবাবে আমরা বলি–

হ্যাঁ, অবশ্যই সন্দেহাতীতভাবে 'তাসাউফ'-শাস্ত্র ও তার অনুশীলনের পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ'তে প্রামাণ্য দলিল বিদ্যমান। ইতিপূর্বে আমরা যা বলেছি, 'তাসাউফ' হলো একটি পারিভাষিক শব্দ, যার উৎস প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবগুলোতে আমাদেরই উদ্ধৃত বিভিন্ন অর্থে নিহিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ'র গভীরেও এর শেকড় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। আর এর উৎস হচ্ছে 'এহসান' তথা পূর্ণতাপ্রাপ্ত অবস্থা, যা রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ'তে, অর্থাৎ, হাদীসে জিবরীল আলাইহিস সালাম নামে খ্যাত হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে; এই হাদীস উলেমাবৃন্দের কাছে 'উম্মুস্ সুন্নাহ' (সুন্নাহ'র উৎস) ও 'উম্মুল আহাদীস' (হাদীসের উৎস) হিসেবে পরিচিত। সকল হাদীসের উৎপত্তিস্থল এই হাদীসকেই বিবেচনা করা হয়। ইসলাম ধর্মে গুরুত্বপূর্ণ হাদীসগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম, আর তাই এর কোনো অতিরিক্ত সমর্থন প্রয়োজন নেই।

উম্মুল আহাদীস: হাদীস-এ-জিবরীল

হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত; তিনি বলেন,

حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لَا يُرَى قَالَ يَزِيدُ لَا نَرَى عَلَيْهِ أَثَرَ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنْ الْإِسْلَامِ مَا الْإِسْلَامُ فَقَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ الْإِيمَانِ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِحْسَانِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ يَزِيدُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ بِهَا مِنْ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ قَالَ

ثُمَّ انْطَلَقَ قَالَ فَلَبِثَ مَلِيًّا قَالَ يَزِيدُ ثَلَاثًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ قَالَ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ

–একদিন আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাজির ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন, যাঁর কাপড় ধবধবে সাদা ও চুল গাঢ় কালো ছিল। তাঁর মধ্যে সফরের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিলো না এবং আমাদের কেউ তাঁকে চিনতেও পারছিলাম না। অবশেষে তিনি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বসলেন এবং নিজের হাঁটুযুগল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় হাঁটুযুগলের সাথে লাগিয়ে দিলেন, আর নিজ হাত নিজ উরুর ওপর রাখলেন। অতঃপর (তিনি) আরয করলেন, 'এয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।' জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'ইসলাম এই যে তুমি এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর (প্রেরিত) রাসূল বা পয়গম্বর। অতঃপর নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোযা রাখবে, পবিত্র কা'বার হজ্জ করবে, যদি সেখানে পৌঁছুতে পারো।' (ওই ব্যক্তি) আরয করলেন, 'আপনি সত্য বলেছেন।' আমরা তাঁর ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হলাম এ কারণে যে তিনি হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে (প্রশ্ন) জিজ্ঞাসাও করেছেন এবং (এখন উত্তরের) সত্যায়নও করছেন। তিনি আবার আরয করলেন, 'আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।' হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা-মণ্ডলী, (আসমানী) কেতাবসমূহ, তাঁর রাসূলবৃন্দ এবং শেষ (বিচার) দিবসে বিশ্বাস করো। আর ভালো-মন্দ তাকদীরে বিশ্বাস করো।' (ওই ব্যক্তি) আরয

করলেন, 'আপনি সত্য বলেছেন।' (তিনি) পুনরায় আরয করলেন, 'আমাকে এহসান সম্পর্কে বলুন।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, 'আল্লাহর এবাদত (আরাধনা) এভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে খেয়াল করো যে তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।' (ওই ব্যক্তি) আরয করলেন, 'কেয়ামত সম্পর্কে সংবাদ দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'তুমি যাঁর কাছে জিজ্ঞেস করছো, তিনি কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক অবগত নন।' (প্রশ্নকর্তা আবার) আরয করলেন, 'কেয়ামতের কিছু নিদর্শন সম্পর্কে বলুন।' এবার হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'দাসী নিজ মালিককে প্রসব করবে, খালি পা, উলঙ্গ শরীরবিশিষ্ট দরিদ্র এবং মেষ-রাখালদেরকে বড় বড় দালানে গর্ব করতে দেখবে।' (বর্ণনাকারী হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন) অতঃপর ওই প্রশ্নকারী ব্যক্তি চলে গেলেন। আমি সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সম্বোধন করে এরশাদ ফরমালেন, 'হে উমর! তুমি কি জানো এই প্রশ্নকারী কে?' আমি আরয করলাম, 'আল্লাহ ও (তাঁর) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই ভালো জানেন।' তিনি এরশাদ করলেন, 'তিনি জিবরীল আলাইহিস সালাম; তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন'।[৪৭]

---

৪৭. বুখারী : আস সহীহ, বাবু কাওলিহি, ইন্নাল্লাহা ইনদাহা ইলমুন, ৬/১১৫ হাদীস নং ৪৭৭৭।
(ক) মুসলিম : আস সহীহ, বাবু মা'রিফাতিল ঈমান ওয়াল ঈমান, ১/৩৬ হাদীস নং ৮।
(খ) ইব্ন মাজাহ : আস সুনান, বাবুল ঈমান, ১/২৪ হাদীস নং ৬৩।
(গ) আবূ দাউদ : আস সুনান, বাবু ফিল ক্বদরি, ৪/২২৩ হাদীস নং ৪৬৯৫।
(ঘ) তিরমিযী : আস সুনান, ৪/৩০৩।
(ঙ) নাসায়ী : আস সুনান, ৮/৯৭, বাবু না'তিল ইসলাম, হাদীস নং ৪৯৯০।
(চ) আহ্মদ : আল মুসনাদ, ১/৩৯৫।
(ছ) বায্যার : আল মুসনাদ, ২/৯৯।
(জ) ইব্ন হিব্বান : আস সহীহ, ১/৩৭৫ হাদীস নং ১৫৯।

ওপরে বর্ণিত হাদীটিতে হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম দ্বীন তথা ধর্মকে কয়েকটি শ্রেণী বা প্রধান শাখায় ভাগ করেছেন, যেগুলো থেকে গোটা ধর্ম, আহাদীস ও সুন্নাহ প্রবাহিত হয়। অধিকন্তু, তিনি প্রত্যেকটি শাখা সম্পর্কে আলাদা আলাদা প্রশ্ন করে প্রতিটি শাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। 'ইসলাম কী?' তাঁর এ প্রশ্নের সাথে প্রথম শাখাটি সম্পৃক্ত। 'ঈমান কী?' এ প্রশ্নের সাথে দ্বিতীয়টি সংশ্লিষ্ট। আর 'এহসান কী?' প্রশ্নটির সাথে তৃতীয় শাখাটি সম্পর্কিত। আমরা বলতে পারি না যে ধর্ম শুধু ইসলাম, বা শুধু ঈমান, অথবা শুধু এহসান। আমরা বলি, এগুলোর প্রত্যেকটি-ই দ্বীনের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় বিষয়; কোনোটি-ই বাদ দেয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রদত্ত জবাবে এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম চলে যাওয়ার পর তাঁর সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু-কে বলেছেন, "জিবরীল আলাইহিস সালাম তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।"

হাদীস-এ-জিবরীল আলাইহিস সালাম থেকে আমরা দেখতে পাই যে তিনি (জিবরীল) ধর্মকে তিনটি ভিত্তিস্তম্ভে তথা অত্যাবশ্যকীয় অংশে ভাগ করেছেন। প্রথমটি, অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে ধর্মের ভিত্তিস্তম্ভ। দ্বিতীয়টি ঈমানের ভিত্তিস্তম্ভ। আর তৃতীয়টি এহসানের ভিত্তিস্তম্ভ। প্রথম স্তম্ভ দ্বীন-ইসলাম হচ্ছে ধর্মের ব্যবহারিক দিক, যা'তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবাদত-বন্দেগী, আমল (অনুশীলন) এবং অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। ওই স্তম্ভের অবস্থা হচ্ছে নিজ সত্তার বাহ্যিক দিক, যেটি শরীর ও সমাজের সাথে সম্পৃক্ত। উলেমাবৃন্দ ওই স্তম্ভকে শরীয়ত বলে আখ্যা দেন। এ শাখায় আলেম-উলেমা বিশেষায়িত শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং এটির নামকরণ হয় ফেকাহ-শাস্ত্র। দ্বিতীয় স্তম্ভটি হচ্ছে ঈমান যা মস্তিষ্ক ও অন্তরের দ্বারা বিশ্বাস স্থাপনের সাথে জড়িত। এর মানে আল্লাহ পাক, তাঁর রাসূল আলাইহিমুস সালামবৃন্দ, তাঁর আসমানী কেতাবসমূহ, ফেরেশতা-মণ্ডলী, শেষ (বিচার) দিবস, তাকদীর (ভাগ্য, নিয়তি) ইত্যাদিতে বিশ্বাস স্থাপন। এই জ্ঞানের শাখাটি উলেমাবৃন্দের কাছে 'এলম আত্ তাওহিদ' নামে সুপরিচিত।

দ্বীন-ইসলামের তৃতীয় অংশ 'এহসান' (চারিত্রিক পূর্ণতা)

ধর্মের তৃতীয় দিকটি অন্তরের আধ্যাত্মিক অবস্থা হিসেবে জ্ঞাত, যা কাউকে ধর্মের প্রথম স্তম্ভ এবাদত-বন্দেগী ও দ্বিতীয় স্তম্ভ ঈমানদারীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের সময় এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলে যে তিনি আল্লাহ তা'আলার উপস্থিতিতে আছেন এবং খোদাকে নিজের সকল কর্মে ও চিন্তায় দেখতে পাচ্ছেন। আর যদি আল্লাহ তা'আলাকে দেখা না যায়, ইহ-জীবনে যেটি সম্ভব নয়, তাহলে এই সদা-সচেতনতা বজায় রাখা যে আল্লাহ পাক সবসময় আমাদের হৃদ-রাজ্যে উপস্থিত আছেন এবং তিনি আমাদের ঈমানদারী ও আমলের নাড়িনক্ষত্র সম্পর্কে খবর রাখেন, অর্থাৎ, তিনি আমাদের এবাদত ও আকীদা-বিশ্বাসের অবস্থা ও গুণাগুণ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল আছেন। এরই ফলশ্রুতিতে আপনার মধ্যে এক পূর্ণতাপ্রাপ্ত তথা উন্নতমানের অবস্থার সৃষ্টি হবে, যা নিজের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ঐশীদৃষ্টি সম্পর্কে নিজেকে সচেতন করে তুলবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর করুণাধারা ও ঐশী দানের মাধ্যমে আপনার অন্তরে যে আধ্যাত্মিকতার আলো বিচ্ছুরণ করবেন, তারই আধ্যাত্মিক স্বাদ আপনি আস্বাদন করবেন। উলেমাবৃন্দ এই জ্ঞানের শাখাকে 'এলম আল-হাকীকত' তথা সত্যের বিদ্যাশাস্ত্র নামে আখ্যা দেন; আর এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছাকাছি সময়ে এই নামেই পরিচিত ছিল; অধিকন্তু, সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুমের সময়কালে এটি পরিচিত ছিল 'আস্ সিদ্দিকিয়্যা' বা সিদ্দীকবৃন্দের পথ নামে। পরবর্তীকালেই শুধু এটি 'তাসাউফ' নামে সুপরিচিত হয়।

ওপরের আলোচনার সারসংক্ষেপ হিসেবে বলা যায়, 'ইসলাম' একজন মুসলমানের আচার-আচরণ নির্দেশ করে, 'ঈমান' তাঁর আকীদা-বিশ্বাসসংক্রান্ত এবং তা ব্যাখ্যা করে, আর 'এহসান' অন্তরের এমন অবস্থাকে নির্দেশ করে যেটি কারো জন্যে 'ইসলাম' ও 'ঈমান' ইহ ও পরকালীন জীবনে ফলদায়ক হবে কি না তা নির্ধারণ করে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত একখানি হাদীসে এর পক্ষে প্রমাণ বিদ্যমান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই হাদীসে এরশাদ ফরমান:

وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.

–নিশ্চয় (মানুষের) শরীরে এক টুকরো গোস্ত আছে, যেটি পবিত্র হলে সারা শরীর পবিত্রতা অর্জন করে; আর তা অপবিত্র হলে সারা শরীর অপবিত্রতা লাভ করে; নিশ্চয় শরীরের সে অংশটি হচ্ছে হৃদয় (অন্তর)।[৪৮]

অতএব, 'উম্মুল আহাদীস' নামে খ্যাত হাদীসে জিবরীল আলাইহিস সালাম হতে আমরা দেখতে পাই যে দ্বীন/ধর্ম তিনটি অবস্থার সমষ্টি: ইসলাম, ঈমান ও এহসান। প্রথম স্তম্ভ 'ইসলাম" পাঁচটি অংশে বিভক্ত: 'শাহাদা', 'সালাত', 'যাকাত', 'সওম' ও 'হজ্ব'। 'ঈমান' বিভক্ত ছয়টি অংশে: 'আল-ঈমানু বিল্লাহি', 'মালা'ইকাতিহী', 'কুতূবিহী', 'রাসূলিহী', 'এয়াওমুল আখির' ও 'কদর'। 'এহসান' অনেক অংশে বিভক্ত, যার মধ্যে রয়েছে কোনো ঈমানদার মুসলমানের সকল সৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী। এসব অংশে অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়: খোদা-সম্পর্কিত সচেতনতা (তাকওয়া); খোদা-ভীতি (ওয়ারা); (পাপ হতে) বিরত থাকা (যুহদ); শ্রদ্ধা ও বিনয় (খু'শু ও খুযু); ধৈর্য (সবর); সত্যবাদিতা (সিদক); খোদার ওপর ভরসা (তাওয়াক্কুল); নৈতিকতা ও সচ্চরিত্র (আদব) যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে গুরুত্বারোপ করেন এই বলে, أَدَّبَنِيْ رَبِّيْ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِيْ "আমার প্রভু আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদব শিক্ষা দেন এবং তিনি আমার শিষ্টাচারে পূর্ণতা দিয়েছেন"; সহিষ্ণুতা বা তিতিক্ষা (হিলম); করুণা (রাহমা); মহত্ত্ব (করম); নিজেকে বিনয়ী করা (তাওয়াদা'আ); লজ্জা-শরম (হায়া); সাহস (শুজা'আ) এবং আরও অনেক গুণ যেগুলো দ্বারা

[৪৮]. বুখারী : আস সহীহ, ১/২০ হাদীস নং ৫২।
(ক) মুসলিম : আস সহীহ, ৩/১২১৯ হাদীস নং ১৫৯৯।
(খ) ইব্‌ন মাজাহ : আস সুনান, ২/১৩১৮ হাদীস নং ৩৯৮৪।
(গ) আহমদ : আল মুস্‌নাদ, ৪/২৭০ হাদীস নং ১৮৩৯৮।
(ঘ) দারেমী : আস সুনান, ৩/১৬৪৭ হাদীস নং ২৫৭৩।
(ঙ) ইব্‌ন আবী শায়বা : ৪/৪৪৮ হাদীস নং ২২০০৩।
(চ) ত্বরানী : আল মু'জামুল কাবীর, ২১/৬৪।

আহ পাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সুশোভিত করেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে হযরত মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ মানে হযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র হচ্ছে 'মূর্তমান (বা জীবন্ত) কুরআন।'[৪৯] অপর দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সেসব উন্নত নৈতিক গুণাবলী দ্বারা তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমকে সুশোভিত করেন, যার দরুন মনুষ্যজাতি আপন স্রষ্টা ও নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক কী সম্পর্ক নিয়ে অস্তিত্বশীল থাকবে, তার এক সর্বাধিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত তাঁরা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আমরা পরবর্তী কোনো সময়ে ইমাম নববী রহমতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রদত্ত উম্মুল আহাদীস (জিবরীল)-এর ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করতে সচেষ্ট হবো; এটি আট পৃষ্ঠারও বেশি একখানা ব্যাখ্যা। তাতে তিনি 'তাসাউফেরই' শাখা 'এলমুল মোশাহাদা' (সাক্ষ্যসম্পর্কিত জ্ঞান) ও 'এলমুল হাকীকা' (বাস্তবতাবিষয়ক জ্ঞান)-এর আওতায় 'এহসান'-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তবে আমাদের হাতে এখানে তা উদ্ধৃত করার সময় বা স্থান এ মুহূর্তে নেই।

'এহসান' ও 'তাযকিয়্যা'-বিষয়ক বিদ্যাশাস্ত্র

হযরতে সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম যে (ধর্মীয়) বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং (আধ্যাত্মিকতায়) দীক্ষা লাভ করেন, তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেসালের (পরলোকে খোদার সাথে মিলনপ্রাপ্তির) সাথে সাথে তিরোহিত হয়নি। বরঞ্চ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জ্ঞান ও হেকমত পদ্ধতি (মযহাব ও তরীকত) দ্বারা খোদায়ী আশীর্বাদধন্য হয়েছিলেন, তা তিনি

[৪৯]. আহ্‌মদ : আল মুস্‌নাদ, ৬/৯১।
(ক) মুশকিলুল আছার : আশ শরাহ, ১১/২৬৫ হাদীস নং ৪৪৩৪।
(খ) মু'জামুল আওসাত্ব : আত ত্বরানী, ১/৩০ হাদীস নং ৭২।
(গ) বাগাবী : আশ শরহুস সুন্নাহ, ১৩/৭৬ হাদীস নং ৩৪৯৪।
(ঘ) বুখারী : আদাবুল মুফরাদ, ১/৭৬।

তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের মাঝে ছড়িয়ে দেন; আর তাই তাঁদের প্রত্যেকেই ওই বিদ্যাশাস্ত্রের এক-এক আধারে পরিণত হন যা থেকে সমগ্র উম্মাহ তথা মুসলমান সমাজ জ্ঞান ও হেকমত শিক্ষাপদ্ধতি লাভ করেন। সময়ের পরিক্রমণে এসব শিক্ষাপদ্ধতি আরও উন্নত হয় এবং এগুলোর নিজস্ব নিয়মকানুন প্রণীত হয়। অধিকন্তু, এর দরুন 'তাসাউফ' নামের একটি স্বতন্ত্র বিদ্যাশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। ইসলামের প্রথম তিন শতকে যেমন শরীয়তের মযহাবগুলোর উৎপত্তি হয়, ঠিক তেমনি 'তাসাউফ'-শাস্ত্রের স্বতন্ত্র ও স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান 'তরীকাহ'-গুলোও পরবর্তী মুসলিম প্রজন্মের কাছে এ বিদ্যাশাস্ত্রের জ্ঞান-প্রজ্ঞা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সেসময় গঠিত হয়। উপরন্তু, শরীয়ত যেমন ইসলাম, কুরআন ও সুন্নাহ'র কাঠামোর বাইরে গড়ে ওঠে নি, যদিও সেটির শাখা-প্রশাখা ও জ্ঞানের আওতাভুক্ত ছিল সেসব বিষয় যেগুলো ওপরোক্ত উৎসগুলোতে হুবহু উল্লেখিত ছিল না, তদ্রূপ 'তাসাউফ'-শাস্ত্রও কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক কাঠামোর ওপর গড়ে ওঠে এবং তা কখনোই সেই কাঠামোর বাইরে যায়নি।

'শরীয়াহ' ও 'হাকীকত'-এর পারস্পরিক সম্পর্ক

'ফেকাহ'-শাস্ত্র নামে পরিচিত 'শরীয়াহ' ও 'এহসান' বা 'তাসাউফ' নামে জ্ঞাত বিদ্যাশাস্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে ওপরে যা বলেছি, তা ব্যাখ্যা করতে আমরা এখানে একটি উদাহরণ দেবো। নজির হিসেবে 'সালাত' তথা নামাযের কথাই ধরা যাক। 'ফেকাহ'-শাস্ত্র মোতাবেক শরীয়তে উল্লেখিত শারীরিক নড়াচড়াসহ সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় শর্ত ও নিয়মকানুন মেনে নামায পড়া বাধ্যতামূলক। এটি 'জাসাদ আস্ সালাত' তথা নামাযের কাঠামো নামে খ্যাত। অপরদিকে, নামাযের একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হলো গোটা নামাযেই আল্লাহ তা'আলার ঐশী উপস্থিতি নিজ অন্তরে জারি রাখা এবং তিনি যে আপনাকে দেখছেন সে ব্যাপারে জানা। এর ফলশ্রুতিতেই আপনি নামাযের গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে জানবেন এবং তার বাস্তবতার স্বাদ আস্বাদন করতে সক্ষম হবেন। আর আমরা নামাযের অনুশীলন থেকে এও জানতে পারি যে কেউ কেউ সেটির বাহ্যিক শর্তাবলী মেনে নামায পড়ে সত্য, কিন্তু তাদের অন্তর তাতে হাজির থাকে না। আমরা 'এহসান' অবস্থা বলতে যা বোঝাই তা হলো, অন্তরকে মন্দ স্বভাব ও আচরণ

থেকে নির্মল এবং দুনিয়ার সমস্ত মনোযোগ বিচ্যুতিকর বিষয় থেকে মুক্ত রাখা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রীতিনীতি-ই অনুশীলন করেছিলেন, কেননা তিনি বলেছিলেন মানুষদেরকে দুনিয়ার আকর্ষণ হতে সরাতে এবং এর মনোযোগ বিচ্যুতিকর বিষয়াদি থেকে তাদেরকে মুক্ত করতেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন।

অতএব, আমরা এখানে দেখতে পাই যে সালাত তথা নামাযের বাহ্যিক আবরণ হচ্ছে তার কাঠামো, আর বিনয় ও অবনত সত্তা (খুশু') হচ্ছে তার রূহ বা আত্মা। আত্মা ছাড়া দেহের সুফল বা কার্যকারিতা কোথায়? হুযূরি কলব্ তথা অন্তরের উপস্থিতি ছাড়া শারীরিক নড়াচড়ার নাম যদি হয় সালাত, তাহলে তা হবে জীবন্ত লাশ ও অর্থহীন কর্মকাণ্ড। আত্মার বসতির জন্যে যেমন দেহ প্রয়োজন, ঠিক তেমনি জীবন্ত করে তোলার জন্যে দেহেরও আত্মাকে একান্ত প্রয়োজন। দেহ ও আত্মার সম্পর্কের মতোই হচ্ছে শরীয়ত ও হাকীকতের মধ্যকার প্রকৃত সম্পর্ক। পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি যিনি 'এহসান' অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন, কেবল তিনি-ই 'শরীয়াহ' ও 'হাকীকত'-কে একসাথে সংযুক্ত করতে সক্ষম হবেন। এটি-ই 'তাসাউফ'-এর মৌলিক উপলব্ধিঃ দেহ ও আত্মার মধ্যে সংযোগ স্থাপন, 'শরীয়াহ' ও 'হাকীকত'-এর মধ্যে সমন্বয় সাধন।

মহান ইমামবৃন্দ 'তাসাউফ' সম্পর্কে যা বলেছেন

যুগের শায়খুল ইসলাম ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি যিনি ৯৫ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং যাঁকে তাবেঈনদের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা হতো, তিনি এ প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত উপদেশ-বাণীতে বলেন:

"যে ব্যক্তি ফেকাহ্ শিক্ষা করে কিন্তু তাসাউফকে অবহেলা করে সে ধর্ম প্রত্যাখ্যানকারী হিসেবে সাব্যস্ত হয়; আর যে ব্যক্তি তাসাউফ শিক্ষা করে কিন্তু ফেকাহকে অবহেলা করে, সে বিচ্যুত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি দুটোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, সে অবশ্যই সত্যে পৌঁছুতে সক্ষম হয়।"

ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি হাকীকত ছাড়া শরীয়তকে স্বীকার করেননি; আবার শরীয়ত, ফেকাহ, ইসলাম ও এহসান অবস্থা ছাড়া হাকীকতকে মেনে নেননি।

ইমাম শাফেঈ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

"এই জীবনের তিনটি বিষয় আমি পছন্দ করি: প্রথমতঃ মন্দ স্বভাব ও আচরণ পেছনে ফেলে আসা; দ্বিতীয়তঃ অন্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন; এবং তৃতীয়তঃ 'তাসাউফ'-এর পথ (তরীকাহ) দ্বারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া।"

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পুত্রকে উপদেশ দেন এ কথা বলে:

"ওহে আমার পুত্র, সূফী-দরবেশদের সান্নিধ্যে থেকো; কেননা তাঁরা জ্ঞান-প্রজ্ঞায়, খোদাভীতি ও (তাঁর অস্তিত্বের) সচেতনতায়, কৃচ্ছ্রতায় এবং পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে নিষ্ঠার মাত্রায় আমাদের চেয়ে অনেক অগ্রসর।"

চার মযহাব প্রত্যাখ্যানকারীর ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়ার অভিমত

আমাদের উল্লেখিত তিনজন ইমাম হলেন আহল আস্ সুন্নাহ'র প্রখ্যাত ইমামবৃন্দেরই অন্তর্ভুক্ত যাঁদের সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া তার প্রণীত 'আল-মোখতাসার আল-ফাতাওয়া আল-মাসরিয়্যা' পুস্তকের (মাদানী প্রকাশনী, ১৯৮০) ৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা দিয়েছে। ওতে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'চার (মযহাবের) ইমামকে কেউ গ্রহণ না করলে তার ব্যাপারে আপনার মতামত কী?'

ইবনে তাইমিয়া জবাবে বলে, "(মুজতাহিদের জন্যে) কোনো একটি নির্দিষ্ট মযহাবকে অনুসরণ করা অপরিহার্য নয়। বরঞ্চ আপনি সবগুলো থেকেই বেছে নিতে পারেন; আর এটি উত্তমও বটে। কিন্তু আপনি যদি এ কথা বলেন 'আমি চার মযহাব মানবো না, বরং আমার এজতেহাদ অনুযায়ী অনুশীলন করবো' তাহলে আপনি সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্তিতে পতিত হবেন। কেননা সত্যটি এই চার মযহাবের মধ্যেই নিহিত এবং এগুলো যা বর্ণনা করেছে, তা সত্যের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ।"

ইবনে তাইমিয়ার কথায় চার মযহাবের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। আর এ কারণেই সে চার মযহাবকে স্বীকার করে নিয়ে সেগুলোর মতামত নিয়েছে। ইবনে তাইমিয়া মুফতী হওয়াতে তা পেরেছিল; অতএব, আমরা এ শতাব্দীতে আগমন করে তাবেঈনদের যুগের মুসলিম জ্ঞান বিশারদদের (অর্থাৎ, চাব মযহাবের ইমামবৃন্দের) বাণী এবং ইবনে

তাইমিয়ার সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে আগত ইসলামী পণ্ডিতদের কথাও মেনে নিয়েছি; আর আমরা ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য-ও উদ্ধৃত করছি যেভাবে উলামাবৃন্দ একে অপরের বাণী উদ্ধৃত করতেন।

আমরা এখানে ব্যক্ত করছি যে, কোনো বিষয় সম্পর্কে আমাদের মধ্যে এখতেলাফ বা মতপার্থক্য হলে সেটি পূর্ববর্তী উলেমাবৃন্দের মধ্যকার মতপার্থক্য-ই, আমাদের নয়। কেননা, আমরা তাঁদের বইপত্র থেকে যা শিখেছি তা-ই উদ্ধৃত করেছি; আর সেসব বই শরীয়ত ও সুন্নাহ'র সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। অতএব, আমরা 'তাসাউফ' সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার সময় ইবনে তাইমিয়া বা অন্যান্য আলেম-উলেমার দৃষ্টিকোণ থেকে তা করলে তাঁদের মতামতের ওপর ভিত্তি করেই কাউকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাই আমরা বলছি: আল্লাহ পাক আমাদের রক্ষা করুন এবং ওই সকল মহান ইমাম হতে জ্ঞান শিক্ষা করতে সহায়তা করুন। কেননা তাঁরা আল-কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ হতে তাঁদের জ্ঞান আহরণ করেছিলেন।

বস্তুতঃ এখান থেকেই আমরা এ বিষয়ে উলেমাবৃন্দ যা বলেছিলেন তার গভীর থেকে আরও গভীরে যেতে পারি, কারণ এ বিদ্যাশাস্ত্র অত্যন্ত ব্যাপক; এতোই ব্যাপক যে আমরা এটি ব্যাখ্যা করতে আরও সময় চেয়েছিলাম।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রশ্নগুলোর উত্তর

বাকি প্রশ্নগুলো হচ্ছে–

৪. আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সূফী ছিলেন? হ্যাঁ হলে অনুগ্রহ করে কুরআন ও সুন্নাহ হতে সুস্পষ্ট প্রামাণ্য দলিল পেশ করুন।

৫. আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সূফীতত্ত্ব বা 'তাসাউফ' চর্চা করেছিলেন? হ্যাঁ হলে কুরআন ও সুন্নাহ হতে দালিলিক প্রমাণ প্রদর্শন করুন।

৬. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সূফীবাদ বা 'তাসাউফ' অনুশীলন করতে বলেছিলেন বা আদেশ করেছিলেন? হ্যাঁ হলে কুরআন ও সুন্নতে নববী থেকে প্রমাণ পেশ করুন।

আপনি (শায়খ আদলী) চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ যে প্রশ্নগুলো করেছেন, তা আমাদের প্রথম তিনটি উত্তরেই দেয়া হয়েছে। আমরা যেহেতু জানি আমাদের শ্রোতামণ্ডলী জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান, সেহেতু আমরা নিশ্চিত যে প্রথম তিনটি উত্তরে দেয়া চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরগুলো তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে সক্ষম। অধিকন্তু, মতীন সিদ্দিকী তাঁর গতকালকের পোস্টে চতুর্থ প্রশ্নটির আরও চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ওর যথাবিহিত উত্তর দিয়েছেন।

আমরা আশা করি আমাদের পাঠকমণ্ডলী ও প্রিয় দ্বীনীভাই শায়খ আদলীকে তাঁদের প্রত্যাশানুযায়ী উত্তর দিতে পেরেছি, যদিও তা সংক্ষিপ্ত ছিল। আমরা ইতিপূর্বে পরিকল্পনা করেছিলাম প্রতিটি প্রশ্নের সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত উত্তর দেবো। কিন্তু সময়ের স্বল্পতাহেতু এবং মানুষের পীড়াপীড়িতে আমরা এই উত্তরকে সংক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছি। এতে পরিস্ফুট হবে 'তাসাউফ' কতোখানি ব্যাপক একটি বিষয়, যেটি তাঁরা এখন ছয়টি প্রশ্নে সীমাবদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন, কেননা আমরা অতি সাধারণ মুসলমান। আমরা আমাদের দ্বীনী ভাই ও বোনদের প্রতিও আবেদন জানাই আমাদের সাথে হাত মিলানোর উদ্দেশ্যে তাঁদের হাত বাড়াতে, যেভাবে আল্লাহ তাঁর পাক কালামে আদেশ করেন:

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ

–আল্লাহর রজ্জু শক্তভাবে (আঁকড়ে) ধরো এবং (দল) বিভক্ত হয়ো না।[৫০]

আপনাদের দ্বীনীভাই,
–শায়খ হিশাম কাব্বানী

[৫০]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৩।

[দুই]

সুন্নাহ-ভিত্তিক ইসলামে তাসাউফের স্থান

শায়খ নূহ হা মিম কেলার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

[Bengali translation of Shaykh Nuh Ha Mim Keller's Online article "The Place of Tasawwuf in Traditional Islam"]

বর্তমান যুগে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন করার সম্ভবতঃ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সুন্নীপন্থী তথা ঐতিহ্যবাহী ইসলামী উলামাবৃন্দের অভাব। এ বিষয়ে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি সহীহ সনদে বর্ণনা করেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একখানা হাদীস, যা'তে তিনি এরশাদ ফরমান:

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا، وَأَضَلُّوا.

–নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ঐশী জ্ঞান তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে অপসারণ করেন না, বরঞ্চ তা অপসারণ করেন ইসলামী উলামাবৃন্দের রূহ (আত্মা)-গুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে (বেসালপ্রাপ্তিতে), যতোক্ষণ একজন আলেম-ও আর অবশিষ্ট না থাকেন; এমতাবস্থায় লোকেরা অজ্ঞ-মূর্খদেরকে তাদের (ধর্মীয়) ইমাম মেনে নেয়, যাদেরকে প্রশ্ন করা হলে না জেনেই ধর্মীয় বিষয়ে তারা ফতোওয়া দেয়; ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ-পথভ্রষ্ট হয়, মানুষকেও পথভ্রষ্ট করে।[৫১]

[৫১]. বুখারী : আস সহীহ, কায়ফা ইয়াক্বিদুল ইলমা, ১/৩১ হাদীস নং ১০০।
(ক) মুসলিম : আস সহীহ, ৪/২০৫৮ হাদীস নং ২৬৭৩।
(খ) ইব্ন মাজাহ : আস সুনান, ১/২০ হাদীস নং ৫২।
(গ) দারেমী : আস সুনান, ১/৩০৮ হাদীস নং ২৪৫।
(ঘ) নাসায়ী : আস সুনান, ৫/৩৯১ হাদীস নং ৫৮৭৬।
(ঙ) তিরমিযী : আস সুনান, ৪/৩২৮ হাদীস নং ২৬৫২।
(চ) ইব্ন হিব্বান : আস সহীহ, ১০/৪৩২ হাদীস নং ৪৫৭১।
(ছ) ত্বরানী : আল মু'জামুল কাবীর, ১৩/৩৯০ হাদীস নং ১৪২১০।

ওপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত প্রক্রিয়াটি এখনো সম্পন্ন হয়নি, তবে নিশ্চিতভাবে তার সূচনা হয়েছে। আর আমাদের এ জমানায় সুন্নীপন্থী উলামাবৃন্দের ঘাটতি, চাই তা ইসলামী বিধি-বিধান (ফেকাহ) ও হাদীস (মহানবীর বাণী) শাস্ত্রেই হোক, অথবা তাফসীর (কুরআন ব্যাখ্যাকারক) শাস্ত্রেই হোক, তা ধর্ম সম্পর্কে এমনই এক বোধ জাগিয়ে তুলেছে যা এতদসংক্রান্ত বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণতা হতে বহু বহু দূরে, এবং কখনো কখনো সত্য হতেও বহু দূরে। উদাহরণস্বরূপ, আমি ইসলামী বিধি-বিধান (ফেকাহ)-বিষয়ক জ্ঞানার্জনকালে প্রাচ্যবিশারদ ও মুসলিম-সংস্কারক লেখনীসমূহ হতে প্রাথমিক ধারণা যেটি পাই, তাতে মনে হয়েছিল মযহাবের ইমাম-মণ্ডলী বুঝি ইসলামী সুন্নাহ'র সম্পূর্ণ বাইরের এক ঝাঁক নিয়মকানুন নিয়ে এসে কোনো না কোনোভাবে মুসলমানদের ওপর তা চাপিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন আমি মধ্যপ্রাচ্যের সুন্নীপন্থী উলামাবৃন্দের সাথে বসে বিস্তারিত জানতে চাইলাম, তখনই আমি কুরআন ও সুন্নাহ হতে আইনকানুন বের করার ভিত্তি সম্পর্কে জানতে পেরে ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফিরলাম।

অনুরূপভাবে, 'তাসাউফের' ক্ষেত্রেও এই শাস্ত্রের উলামাবৃন্দের সাথে আমার বৈঠকে আমি পশ্চিমা বিশ্বে যা দেখতে পেয়েছিলাম, তার থেকে ভিন্ন একটি চিত্রের দেখা পেয়েছি। আজ রাতে আমার এ প্রভাষণে ইনশা'আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে এবং সিরিয়া ও জর্দানের প্রকৃত তাসাউফ-শিক্ষকদের কাছ থেকে এতদসংক্রান্ত জ্ঞান ব্যাখ্যা করা হবে; এটি এ বিবেচনায় যে আমাদেরকে গতানুগতিক ধারণার ঊর্ধ্বে ওঠা প্রয়োজন, আর ইসলামী উৎসগুলো হতে বাস্তব তথ্য জানা দরকার, যাতে এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর জানা যায় যে তাসাউফ কোত্থেকে এসেছে? দ্বীন-ইসলামে এর ভূমিকা কী? আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এ জ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলারই বা হুকুম কী?

'তাসাউফ' শব্দটির উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, অন্যান্য অনেক ইসলামী বিদ্যাশাস্ত্রের মতোই এর নামটি প্রথম মুসলিম প্রজন্মের কাছে

(জ) ইব্ন শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৭/৫০৫ হাদীস নং ৩৭৫৯০।

ছিল অপরিচিত। ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন তাঁর 'মোকাদ্দেমা' গ্রন্থে এ বিষয়ে উল্লেখ করেন:

هَذَا العِلْمُ مِنَ العُلُوْمِ الشَّرْعِيَّةِ الْحَادِثَةِ فِي الْمِلَّةِ. وَأَصْلُهُ أَنَّ طَرِيْقَةَ هَؤُلَاءِ القَوْمُ، لَمْ تَزَلْ عِنْدَ سَلْفِ الأُمَّةِ وَكِبَارِهَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَمِنْ بَعْدِهِمْ، طَرِيْقَةُ الحَقِّ وَالْهِدَايَةِ وَ أَصْلُهَا العُكُوْفُ عَلَى العِبَادَةِ وَالاِنْقِطَاعِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَالإِعْرَاضُ عَنْ زُخْرُفِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا، وَالزُّهْدِ فِيمَا يَقْبَلُ عَلَيْهِ الجَمْهُوْرُ مِنَ لَّذَةٍ وَمَالٍ وَجَاهٍ، وَالاِنْفِرَادُ عَنْ الخَلْقِ فِي الخَلْوَةِ لِلْعِبَادَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَاماً فِي الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ. فَلَمَّا فَشَا الإِقْبَالَ عَلَى الدُّنْيَا فِي القَرْنِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ، وَجَنَحَ النَّاسُ إِلَى مُخَالَطَةِ الدُّنيَا، اِخْتَصَّ المُقْبِلُوْنَ عَلَى العِبَادَةِ بِاسْمِ الصُّوْفِيَةِ وَالمُتَصَوْفَةِ.

–এই জ্ঞান ইসলামী ঐশী বিধানেরই একটি শাখা যার উৎপত্তি উম্মতের মধ্য হতে হয়েছে। সূচনালগ্ন হতেই এ ধরনের পুণ্যাত্মাবৃন্দের পথকেও সত্য ও হেদায়াতের রাস্তা, সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম, তাঁদের দ্বারা প্রশিক্ষিত তাবেঈন ও তৎপরবর্তী সময়ে আগত তাবে' তাবেঈনের তরীকাহ হিসেবে বিবেচনা করতেন প্রাথমিক যুগের মুসলমান সমাজ ও বিশিষ্টজনেরা।

এটি মূলতঃ এবাদত-বন্দেগীতে নিবেদিত হওয়া, মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ উৎসর্গিত থাকা, দুনিয়ার তাবৎ চাকচিক্য হতে নির্মোহ হওয়া, অধিকাংশ মানুষের অন্বেষিত আনন্দ-বিনোদন, ধনসম্পদ ও সুখ্যাতি পরিহার করা, অন্যদের থেকে দূরে সরে একাকী এবাদত-বন্দেগী পালন ইত্যাদি রীতিনীতির সমষ্টি। এই ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের আচরিত সাধারণ/সার্বিক রীতি। কিন্তু ইসলামী দ্বিতীয় শতক হতে তৎপরবর্তী যুগগুলোতে মানুষের মাঝে যখন দুনিয়াবী মোহ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে

পড়ে, তখন যাঁরা এবাদত-বন্দেগীতে উৎসর্গিত হন তাঁদেরকে 'সুফিয়্যা' বা 'মোতাসাউয়ীফ' (তাসাউফপন্থী আলেম) নামে ডাকা হতো।[৫২]

ইবনে খালদুনের ভাষ্যমতে, "মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ উৎসর্গিত থাকা" মর্মে 'তাসাউফের' সারকথা ছিল "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের আচরিত সাধারণ/সার্বিক রীতি।" অতএব, এ পদটি প্রাথমিক যুগে অস্তিত্বশীল না থাকলেও আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে ইসলামী অনেক বিদ্যাশাস্ত্রের ক্ষেত্রে একই অবস্থা বিদ্যমান ছিল; যেমন 'তাফসীর' (কুরআন-ব্যাখ্যামূলক জ্ঞান), কিংবা 'এলম আল-জারহ ওয়া তা'দিল' (হাদীস বর্ণনাকারীদের গ্রহণযোগ্যতায় প্রভাব বিস্তারকারী ইতিবাচক ও নেতিবাচক উপাদানসমূহ), অথবা 'এলম আত্ তাওহীদ' (ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসসংক্রান্ত জ্ঞান)। এসব জ্ঞানের শাখার সবগুলোই যে ধর্মের সঠিক সংরক্ষণ ও প্রসারে সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করেছে, তা আজ সপ্রমাণিত।

'তাসাউফ' শব্দটির উৎস হয়তো 'সূফী' শব্দ হতে, যা ওই পুণ্যাত্মাবৃন্দকে বোঝায় যাঁরা তাসাউফ অর্জন করেছেন। সূফী শব্দটির উৎপত্তি তাসাউফেরও আগে। কেননা, ইমাম হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি যিনি ১১০ হিজরী সালে বেসালপ্রাপ্ত হন, তাঁর বক্তব্যে উভয় পদের মধ্যে সূফী শব্দটির উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন, "আমি এক সূফীকে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে দেখে তাঁকে এক দিরহাম দিতে চাই। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি।" অতএব, তাসাউফকে বুঝতে হলে সূফী কী তা জানতে চেষ্টা করাই মনে হয় সমীচীন হবে। আর হয়তো সূফী ও তাঁর পথ (তাসাউফ-তরীকত), যা এই বিদ্যাশাস্ত্রের বুযূর্গবৃন্দ বেশির ভাগ সময়ই উল্লেখ করে থাকেন, তার সবচেয়ে যথাযথ সংজ্ঞাটি পাওয়া যায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ থেকে, যা'তে তিনি এরশাদ ফরমান:

[৫২] .ইবনে খালদুন : আল-মোকাদ্দেমা, ফি ইলমিত তাসাউফ, মক্কা দারুল বা'য কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত ১৩৯৭ হিজরী/১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ; ৪৬৭ পৃষ্ঠা।

আল্লাহ পাক বলেন,

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا، فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.

–যে ব্যক্তি আমার ওলী (বন্ধু)-এর প্রতি শত্রুতাভাব পোষণ করে, তার বিরুদ্ধে আমি (আল্লাহ) যুদ্ধ ঘোষণা করি।[৫৩] আমার বান্দা আমার সান্নিধ্য অন্বেষণ করে আমারই পছন্দকৃত ফরয এবাদতের মাধ্যমে; অতঃপর সে আমার সান্নিধ্য লাভ করে নফল (তরীকতের রেয়াযত তথা সাধনা) এবাদত-বন্দেগী দ্বারা, যতোক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি। আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি, আমি তার শ্রবণশক্তি হই যা দ্বারা সে শোনে; তার দৃষ্টিশক্তি হই যা দ্বারা সে দেখে; তার হাত হই যা দ্বারা সে কাজ করে; তার পা হই যা দ্বারা সে চলাফেরা করে। সে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করলে নিশ্চয় (তৎক্ষণাৎ) আমি তা মঞ্জুর করি; সে আমার কাছে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে রক্ষা করি।

ওপরের এ হাদীসে কুদসী বর্ণনা করেছেন সর্ব-ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি, আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহি আলাইহি, আল-বায়হাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি ও অন্যান্য আলেম-উলেমা, যা একাধিক অনুরূপ এসনাদ দ্বারা সহীহ প্রমাণিত। এ রেওয়ায়াত বা বর্ণনাটি তাসাউফের মৌলিক বাস্তবতা প্রকাশ করে, যা নির্ভুলভাবে বোঝায় 'পরিবর্তন'; যে পরিবর্তনের পথকে সুন্নাহ'র সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে

[৫৩]. বুখারী : আস সহীহ, বাবুত তাওয়াদ্বুউ, ৮/১০৫ হাদীস নং ৬৫০২।
(ক) বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, ৫/১৯ হাদীস নং ১২৪৭।

মধ্যপ্রাচ্যের মাশায়েখবৃন্দ সূফী'র সংজ্ঞা হিসেবে বলেন, فَقِيْهٌ عَمِلَ بِعِلْمِهِ مَا اَوْرَثَهُ لَهُ عِلْمًا مَا لَمْ يَعْلَمْ অর্থাৎ, "শরয়ী বিধানে জ্ঞানী পুণ্যাত্মা যিনি যা জানেন তা-ই অনুশীলন করেছেন; অতঃপর আল্লাহ তাঁকে এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ দান করেছেন এমন জ্ঞান যা তিনি জানতেন না।"

স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে বল্লে সূফী হচ্ছেন দ্বীনী জ্ঞানে আলেম-(এ-হক্কানী/রব্বানী)-বৃন্দ। কেননা ওপরের হাদীসে কুদসীটি ঘোষণা করে, "আমার বান্দা আমার সান্নিধ্য অন্বেষণ করে আমারই পছন্দকৃত ফরয এবাদতের মাধ্যমে"; জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই কেবল সূফী আল্লাহর আদেশ বা যা ফরয করা হয়েছে সে সম্পর্কে জানতে পারেন; তিনি যা জানেন তা-ই অনুশীলন বা প্রয়োগ করেন, কারণ হাদীসে কুদসীটি আরও বলে তিনি ফরয এবাদতের মাধ্যমে কেবল আল্লাহর সান্নিধ্য অন্বেষণ করেন না, বরং وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، "সে আমার সান্নিধ্য লাভ করে নফল (তরীকতের রেয়াযত তথা সাধনা) এবাদত-বন্দেগী দ্বারা, যতোক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি।" আর এরই প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন জ্ঞান মঞ্জুর করেন যা তিনি জানতেন না। কেননা হাদীসে কুদসীটি আরও বলে,

فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا.

–আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি, আমি তার শ্রবণশক্তি হই যা দ্বারা সে শোনে; তার দৃষ্টিশক্তি হই যা দ্বারা সে দেখে; তার হাত হই যা দ্বারা সে কাজ করে; তার পা হই যা দ্বারা সে চলাফেরা করে।

এটি আসলে 'তাওহীদ' বা আল্লাহর একত্ব-সম্পর্কিত পূর্ণ সচেতনতাজ্ঞাপক একখানা রূপক, যেটি শ্রবণ, দর্শন, হাত দ্বারা কর্ম সম্পাদন ও পদচারণার মতো মানুষের কাজের প্রেক্ষিতে আল্লাহ সম্পর্কে আল-কুরআনে বিবৃত ওই বাণী উপলব্ধির সমষ্টিও, যে বাণী

ঘোষণা করে, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ "অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্মগুলোকেও"।[৫৪]

বস্তুতঃ সূফী তরীকার উৎস নিহিত রয়েছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ'তে। আল্লাহ তা'আলার প্রতি একনিষ্ঠ বা নিবেদিত হওয়ার নিয়ম চালু ছিল প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মধ্যে। তাঁদের কাছে এটি ছিল নামবিহীন এক (আধ্যাত্মিক) অবস্থা। অন্যদিকে, মুসলমান সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যখন এই (আধ্যাত্মিক) অবস্থা থেকে দূরে সরে যান, তখন-ই এটি একটি স্বতন্ত্র বিদ্যাশাস্ত্রে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় পরবর্তী মুসলিম প্রজন্মগুলোর দ্বারা এ বিদ্যার্জনের জন্যে প্রয়োজন পড়ে এক পদ্ধতিগত প্রয়াসের। অধিকন্তু, প্রাথমিক প্রজন্মগুলোর পরবর্তীকালে ইসলামী পরিবেশে পরিবর্তনের কারণেই তাসাউফ নামের এ বিদ্যাশাস্ত্র অস্তিত্বশীল হয়।

কিন্তু যদি এটি-ই প্রকৃত উৎস হয়, তাহলে আরও তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন দাঁড়ায়: ধর্মের কতোখানি মৌলিক বিষয় এ তাসাউফশাস্ত্র? আর সামগ্রিকভাবে এটি দ্বীন-ইসলামে কোথায় খাপ খায়? সম্ভবতঃ এ প্রশ্নের সেরা উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় মুসলিম শরীফের একটি রেওয়ায়াতে, যা'তে হযরত উমর ফারূক রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لَا يُرَى قَالَ يَزِيدُ لَا نَرَى عَلَيْهِ أَثَرَ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنْ الْإِسْلَامِ مَا الْإِسْلَامُ فَقَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ

৫৪. আল কুর'আন : আস সোয়াফ-ফাত, ৩৭/৯৬ মুফতী আহমদ এয়ার খাঁন রহমতুল্লাহি আলাইহি কৃত 'তাফসীরে নূরুল এরফান'।

وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ الْإِيمَانِ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِحْسَانِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ يَزِيدُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ بِهَا مِنْ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَالْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ قَالَ فَلَبِثَ مَلِيًّا قَالَ يَزِيدُ ثَلَاثًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ قَالَ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ.

–একদিন আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাজির ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন, যাঁর কাপড় ধবধবে সাদা ও চুল গাঢ় কালো ছিল। তাঁর মধ্যে সফরের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিলো না এবং আমাদের কেউ তাঁকে চিনতেও পারছিলাম না। অবশেষে তিনি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে বসলেন এবং নিজের হাঁটুযুগল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় হাঁটুযুগলের সাথে লাগিয়ে দিলেন, আর নিজ হাত নিজ উরুর ওপর রাখলেন। অতঃপর (তিনি) আরয করলেন, 'এয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।' জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'ইসলাম এই যে তুমি এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর (প্রেরিত) রাসূল বা পয়গম্বর। অতঃপর

নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোযা রাখবে, পবিত্র কা'বার হজ্জ করবে, যদি সেখানে পৌঁছুতে পারো।' (ওই ব্যক্তি) আরয করলেন, 'আপনি সত্য বলেছেন।' আমরা তাঁর ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হলাম এ কারণে যে তিনি হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে (প্রশ্ন) জিজ্ঞাসাও করেছেন এবং (এখন উত্তরের) সত্যায়নও করছেন। তিনি আবার আরয করলেন, 'আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।' হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা-মণ্ডলী, (আসমানী) কেতাবসমূহ, তাঁর রাসূলবৃন্দ এবং শেষ (বিচার) দিবসে বিশ্বাস করো। আর ভালো-মন্দ তাকদীরে বিশ্বাস করো।' (ওই ব্যক্তি) আরয করলেন, 'আপনি সত্য বলেছেন।' (তিনি) পুনরায় আরয করলেন, 'আমাকে এহসান সম্পর্কে বলুন।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, 'আল্লাহর এবাদত (আরাধনা) এভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে খেয়াল করো যে তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।' (ওই ব্যক্তি) আরয করলেন, 'কেয়ামত সম্পর্কে সংবাদ দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'তুমি যাঁর কাছে জিজ্ঞেস করছো, তিনি কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক অবগত নন।' (প্রশ্নকর্তা আবার) আরয করলেন, 'কেয়ামতের কিছু নিদর্শন সম্পর্কে বলুন।' এবার হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'দাসী নিজ মালিককে প্রসব করবে, খালি পা, উলঙ্গ শরীরবিশিষ্ট দরিদ্র এবং মেষ-রাখালদেরকে বড় বড় দালানে গর্ব করতে দেখবে।' (বর্ণনাকারী হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন) অতঃপর ওই প্রশ্নকারী ব্যক্তি চলে গেলেন। আমি সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সম্বোধন করে এরশাদ ফরমালেন, 'হে উমর! তুমি কি জানো এই প্রশ্নকারী কে?'

আমি আরয করলাম, 'আল্লাহ ও (তাঁর) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই ভালো জানেন।' তিনি এরশাদ করলেন, 'তিনি জিবরীল আলাইহিস সালাম; তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন'।[৫৫]

এটি সহীহ হাদীস, ইমাম নববী রহমতুল্লাহি আলাইহি যেটিকে ইসলামের ভিত্তিস্বরূপ হাদীসগুলোর একটি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ (জিবরীল তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন) এই শেষ বাক্যটি ব্যক্ত করে যে দ্বীন ইসলাম হাদীসটিতে বর্ণিত তিনটি মৌলিক বিষয়ের সমষ্টি: ১/ ইসলাম, অর্থাৎ, আমাদের প্রতি আল্লাহর আদিষ্ট এতায়াত বা আনুগত্য; ২/ ঈমান, অর্থাৎ, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম কর্তৃক প্রদত্ত অদৃশ্য বিষয়গুলোর সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন; এবং ৩/ এহসান, অর্থাৎ, আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী এমনভাবে করা যেন কেউ তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন।

আল-কুরআনের সূরা মরিয়মে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

–নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করেছি এই কুরআন এবং নিশ্চয় আমি নিজেই সেটির সংরক্ষক।[৫৬]

অতঃপর আমরা যখন আল্লাহ তা'আলার হেকমত তথা ঐশী জ্ঞান ও কৌশল সম্পর্কে চিন্তাকরি এ মর্মে যে তিনি কীভাবে এই কুরআনকে সংরক্ষণ করেছেন, তখন আমরা দেখতে পাই যে (পুণ্যবান) সুন্নী উলেমাবৃন্দ দ্বারা তিনি এটি করেছেন; যাঁদেরকে তিনি (হাদীসটিতে

---

[৫৫]. বুখারী : আস সহীহ, বাবু কাওলিহি, ইন্নাল্লাহা ইনদাহা ইলমুন, ৬/১১৫ হাদীস নং ৪৭৭৭।
(ক) মুসলিম : আস সহীহ, বাবু মা'রিফাতিল ঈমান ওয়াল ঈমান, ১/৩৬ হাদীস নং ৮।
(খ) ইব্ন মাজাহ : আস সুনান, বাবুল ঈমান, ১/২৪ হাদীস নং ৬৩।
(গ) আবূ দাউদ : আস সুনান, বাবু ফিল ক্বদরি, ৪/২২৩ হাদীস নং ৪৬৯৫।
(ঘ) তিরমিযী : আস সুনান, ৪/৩০৩।
(ঙ) নাসায়ী : আস সুনান, ৮/৯৭, বাবু না'তিল ইসলাম, হাদীস নং ৪৯৯০।
(চ) আহ্মদ : আল মুস্নাদ, ১/৩৯৫।
(ছ) বায্যার : আল মুস্নাদ, ২/৯৯।
(জ) ইব্ন হিব্বান : আস সহীহ, ১/৩৭৫ হাদীস নং ১৫৯।
[৫৬]. আল কুর'আন : আল হুজর, ১৫/৯।

উল্লেখিত) ধর্মের প্রতিটি স্তরে কাজ করতে পাঠিয়েছেন। ইসলামের ক্ষেত্রে শরীয়তের ইমামবৃন্দ (আইম্মায়ে মযাহিব); ঈমানের ক্ষেত্রে আকায়েদের ইমামবৃন্দ; এবং এহসান মানে "আল্লাহর এবাদত (আরাধনা) এভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো", এ বিদ্যার ক্ষেত্রে তাসাউফের ইমামবৃন্দ এ মহান দায়িত্ব পালন করেছেন।

'আল্লাহর এবাদত করো' হাদীসের এ বাণীটি নিজেই (ইসলামের) এই তিনটি মূল বিষয়ের (মানে ইসলাম, ঈমান ও এহসানের) আন্তঃসম্পর্ক আমাদের প্রদর্শন করে থাকে। কেননা, কীভাবে 'এবাদত-বন্দেগী' করতে হবে সে সম্পর্কে জানা যায় শুধু দ্বীন-ইসলামের প্রকাশ্য বিধি-বিধান থেকে; পক্ষান্তরে, এই আরাধনার গ্রহণযোগ্যতার পূর্বশর্ত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা ও ইসলামের ঐশী বিধানের প্রতি ঈমান তথা বিশ্বাস পোষণ, যেটি ছাড়া এবাদত স্রেফ শারীরিক কসরতে পরিণত হবে এবং ফলদায়ক বা গ্রহণযোগ্য হবে না; অপরদিকে, 'যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো' এ কথাটি স্পষ্ট প্রতীয়মান করে যে এহসান একটি মানবিক পরিবর্তনের সূচনাকারী, কারণ এতে নিহিত রয়েছে এমন-ই এক অভিজ্ঞতা যা আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ সঞ্চয় করেননি। তাই তাসাউফ-শাস্ত্রকে বুঝতে হলে ইসলাম ও ঈমানের প্রেক্ষাপটে এ পরিবর্তনের প্রকৃতিকে আমাদের অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করতে হবে; আর আজ রাতে এটি-ই হবে আমার আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ইসলামের পর্যায়ে আমরা বলেছিলাম যে 'খোদায়ী আজ্ঞার প্রতি সমর্পণের' মাধ্যমে তাসাউফের প্রয়োজন পড়ে দ্বীন-ইসলামকে; কিন্তু ইসলামেরও নিজস্ব প্রয়োজনে একইভাবে তাসাউফকে প্রয়োজন পড়ে। কেন? এটি এই সঙ্গত কারণে যে, মুসলমানদেরকে যে সুন্নাহ অনুসরণের আদেশ দেয়া হয়েছে, তা কেবল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও কর্ম-ই নয়, বরং তাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাঁর অন্তরের আহওয়াল তথা আধ্যাত্মিক অবস্থা, যেমন তাকওয়া বা খোদাভীরুতা, এখলাস বা নিষ্ঠা, তাওয়াককুল বা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা, রাহমা বা করুণা, তাওয়াদু বা বিনয় ইত্যাদি গুণাবলী।

অধিকন্তু, ইসলামী নৈতিকতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মানুষের কর্ম শুধু সঠিক ও ভুল, এ দুটি ভাগে কিন্তু বিভক্ত নয়। বরঞ্চ তা পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত, যা সেগুলোর পারলৌকিক জগতের ফলাফল মোতাবেক ক্রমানুসারে বিন্যস্ত। ওয়াজীব বা বাধ্যতামূলক আমল পালন পরলোকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পুরস্কৃত হবে, আর তা পালন না করলে শাস্তি পেতে হবে। মানদূব হচ্ছে সেসব আমল যেগুলো অনুশীলন করলে সওয়াব পাওয়া যাবে, না করলে গুনাহ হবে না। মোবাহ হচ্ছে অনুমতিপ্রাপ্ত, সওয়াব বা শাস্তির সাথে তা (মূলতঃ) সম্পৃক্ত নয়। মাকরূহ বা কটু হচ্ছে সেসব বিষয় যার বর্জনকে পুরস্কৃত করা হবে, কিন্তু চর্চাকে শাস্তি দেয়া হবে না। হারাম (অবৈধ) বিষয়গুলোর বর্জনকে পুরস্কৃত করা হবে এবং চর্চাকে শাস্তি দেয়া হবে, যদি কেউ তা হতে তওবা না করে মারা যান।

কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ সরলভাবে আমাদের কাছে ব্যক্ত করে যে মানুষের অন্তরের অবস্থা এসব শিরোনামের প্রতিটিরই অন্তর্গত। তবু ফেকাহ বা ঐশী বিধি-বিধানের বইপত্রে এগুলো আলোচিত হয়নি; কেননা নামায, রোযা, যাকা'তের ব্যতিক্রম হিসেবে এগুলো পরিমাপ করা যায় না এ মর্মে যে কতোটুকু পরিমাণ এর অনুশীলন করতে হবে। গণনাযোগ্য না হলেও এগুলো প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। চলুন, কিছু উদাহরণের দিকে তাকানো যাক–

১. আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা:

আল-কুরআনের সূরা বাকারায় আল্লাহ পাক তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপনকারীদেরকে দোষারোপ করেন; কারণ এরা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের উপাস্য মূর্তিকে ভালোবাসে। অতঃপর তিনি এরশাদ ফরমান:

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِۗ

–ঈমানদারদের অন্তরে আল্লাহর মতো কারো ভালোবাসা নেই।[৫৭]

এ আয়াতে মহান প্রভু (মুসলমানদের) ঈমানদারির শর্তারোপ করেছেন যে তাঁর চেয়ে বেশি কাউকে ভালোবাসা যাবে না।

[৫৭]. আল কুর'আন : আল বাক্বারা, ২/১৬৫।

২. করুণা:

আল-বুখারী ও মুসলিম রহমতুল্লাহি আলাইহিমা বর্ণনা করেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান:

مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ، لَا يَرْحَمْهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

–যে কেউ মানুষের প্রতি করুণাশীল না হলে আল্লাহ পাক ও তার প্রতি করুণাশীল হবেন না।[৫৮]

৩. পারস্পরিক ভালোবাসা:

ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজ সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান:

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا.

–শপথ আল্লাহর নামে, যাঁর হাতে আমার রূহ (আত্মা)! তোমাদের মধ্যে কেউই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যতোক্ষণ না তোমরা ঈমান আনো, আর কেউই তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতোক্ষণ না তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসো।[৫৯]

৪. নামাযে একাগ্রতা:

ইমাম আবূ দাউদ রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজ সুনান পুস্তকে বর্ণনা করেন যে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ تُسْعُهَا ثُمْنُهَا سُبْعُهَا سُدْسُهَا خُمْسُهَا رُبْعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا.

–নিশ্চয় কোনো মানুষ (দুনিয়া) ত্যাগ করলে তার সালাত/নামাযের এক-দশমাংশ লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে; বা এক-নবমাংশ, কিংবা এক-অষ্টমাংশ, অথবা এক-সপ্তমাংশ, বা এক-ষষ্ঠাংশ, কিংবা এক-

[৫৮]. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু রহমাতিহি, ৪/১৮০৯ হাদীস নং ২৩১৯।
(ক) আহ্‌মদ : আল মুস্‌নাদ, ওয়া মিন হাদিছি জরীর, ৩১/৫০৭ হাদীস নং ১৯১৬৯।
(খ) বুখারী : আদাবুল মুফরাদ, ১/১৩৫ হাদীস নং ৩৭০।
[৫৯]. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু বয়ানি আন্নাহু লা ইয়াদখুলুল জান্নাত, ১/৭৪ হাদীস নং ৫৪।
(ক) আহ্‌মদ : আল মুস্‌নাদ, ১৫/৪৪২ হাদীস নং ৯৭০৯।

পঞ্চমাংশ, বা এক-চতুর্থাংশ, অথবা এক-তৃতীয়াংশ, বা অর্ধেক (লিপিবদ্ধ হয়)।[৬০]

তার মানে কারো এবাদত-বন্দেগী ততোক্ষণ কবূল হয় না, যতোক্ষণ তিনি আন্তরিকভাবে আল্লাহ তা'আলার সামনে হাজির না হন।

৫. নবী-প্রেম:

ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدَيْهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

–তোমাদের মধ্যে কেউই ঈমানদার হতে পারবে না যতোক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, পুত্র ও সকল মানবের চেয়ে বেশি ভালোবাসার পাত্র হই।[৬১]

ওপরে বর্ণিত এসব দালিলিক প্রমাণ থেকে এটি স্পষ্ট যে করুণা, ভালোবাসা বা অন্তরের একাগ্রতা, এই (আধ্যাত্মিক) অবস্থাগুলোর কোনোটি-ই গাণিতিকভাবে পরিমাপযোগ্য নয়। কেননা, শরীয়ত সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে বলতে পারে না 'করুণার দুটি একক অনুশীলন করো', অথবা 'হুযূরী কলব্ তথা অন্তরের একাগ্রতার তিনটি একক ধারণ করো', ঠিক যেমনটি সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে নামাযের রাক'আতগুলোর বেলায়। তবু এগুলোর প্রতিটি-ই মুসলমানদের জন্যে ব্যক্তিগতভাবে বাধ্যতামূলক। কতিপয় হারাম তথা 'কঠোরভাবে নিষিদ্ধ' উদাহরণের দিকে নজর দিয়ে পুরো চিত্রটি এক্ষণে সম্পূর্ণ করা যাক:

১. আল্লাহ ভিন্ন কাউকে ভয় করা:

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাক কালামের সূরা বাকারায় এরশাদ করেন:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

[৬০]. আবু দাউদ : আস সুনান, ১/২১১ হাদীস নং ৭৯৬।
[৬১]. বুখারী : আস সহীহ,বাবু হুব্বি রাসূলিল্লাহ, ১/১২ হাদীস নং
(ক) মুসলিম : আস সহীহ, বাবু উযুবি মুহাব্বাতি রাসূলিল্লাহ, ১/৬৭ হাদীস নং ৪৪।

–এবং আমার অঙ্গীকার পূরণ করো, আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ করবো আর বিশেষ করে আমারই ভয় (অন্তরে) রাখো।[৬২]

আয়াতের শেষ বাক্যটি সম্পর্কে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, "এতে মহান আল্লাহ পাক ছাড়া আর কাউকেই ভয় না পেতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।[৬৩]

২/ নৈরাশ্য:

মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান:

إِنَّهُۥ لَا يَاْيْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

–নিশ্চয় (কেউই) আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয় না, শুধু কাফেররা ছাড়া।[৬৪]

এতে কুফর তথা অবিশ্বাসের মতো সম্ভাব্য সর্বনিকৃষ্ট (আত্মিক) অবস্থার সাথে অন্তরের এই অবৈধ অবস্থা (নিরাশা)-কে যোগ করার ইঙ্গিত রয়েছে।

৩. দম্ভ:

ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস, যা'তে তিনি এরশাদ ফরমান:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.

–কেউই জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না যতোক্ষণ তার অন্তরে এক অণুকণা পরিমাণ অহঙ্কার বিরাজ করবে।[৬৫]

৪. ঈর্ষা:

অর্থাৎ, কারো নেয়ামত বা আশীর্বাদপ্রাপ্তিতে হিংসাবশতঃ তার আশীর্বাদের অবসান কামনা করা। ইমাম আবূ দাউদ রহমতুল্লাহি

[৬২]. আল কুর'আন : আল বাক্বারা, ২/৪০।
[৬৩]. তাফসীর আল-ফখরুদ্দীন আল-রাযী, ৩/৪২।
[৬৪]. আল কুর'আন : ইউছুপ, ১২/৮৭।
[৬৫]. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু তাহরিমিল কিবার, ১/৯৩ হাদীস নং ৯১।

আলাইহি বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান:

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

–হিংসার ব্যাপারে সতর্ক হও, কেননা তা নেক আমল বিনষ্ট করে, যেমনিভাবে আগুন কাঠকে পুড়িয়ে খাক করে।[৬৬]

৫. এবাদত-বন্দেগীর প্রদর্শনী:

ইমাম আল-হাকিম রহমতুল্লাহি আলাইহি সহীহ এসনাদ-সহ বর্ণনা করেন হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একখানা হাদীস, যা'তে তিনি এরশাদ ফরমান: নেক আমলে তথা পুণ্যদায়ক কর্মের অনুশীলনে সামান্যতম প্রদর্শনীর মানে হলো আল্লাহর সাথে অন্যান্য সত্তার অর্চনা করা।[৬৭]

এ ধরনের হারাম আত্মিক অবস্থার বিবরণ ফেকাহ বা ইসলামী বিধি-বিধানের বইপত্রে পাওয়া যায় না, কারণ ফেকাহ-শাস্ত্র শুধু গাণিতিকভাবে পরিমাপযোগ্য ঐশী বিধানেরই বিবরণ দেয়। বরঞ্চ এসব (অবৈধ আত্মিক) অবস্থার কারণ ও সমাধান পাওয়া যায় 'অন্তঃস্থিত ফেকাহ' তথা তাসাউফের ইমামবৃন্দেরই বইপত্রে; যেমন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর 'এহইয়াও উলূম-উদ্দীন'(ধর্মীয় জ্ঞানের উজ্জীবন), ইমাম-এ-রব্বানী হযরত আহমদ ফারূকী সেরহিন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর 'মকতুবাত' (পত্রাবলী), সুলতানুল আরেফীন শায়খ শেহাবউদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ' (খোদা-জ্ঞানীদের জ্ঞান) ও অনুরূপ কালজয়ী ইসলামী লেখনীসমূহে, যেগুলো অভ্যন্তরীণ জীবনের হাজারো নীতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে আলোকপাত করে এবং তার সমাধানও দেয়। এসব বইপত্র শরীয়তেরই কেতাবাদি এবং এগুলোতে নিহিত প্রশ্নাবলী ঐশী বিধানসম্পর্কিত বিষয়-ই, যা নির্দেশ করে কোনো মুসলমানের জন্যে কোনটি বৈধ আর কোনটি অবৈধ আত্মিক অবস্থা,

৬৬. আবু দাউদ : আস সুনান, বাবু ফিল হাসাদি, ৪/২৭৬ হাদীস নং ৪৯০৩।
(ক) বায়হাকী : শু'য়াবুল ঈমান, আল হাচ্ছু আলা তরকিল গল্লি ওয়াল হাসাদি, ৯/১০ হাদীস নং ৬১৮৪।
৬৭. আল-মোস্তাদরাক : আলাল-সহীহাইন, ১/৪।

আর এ ক্ষেত্রে তাঁর আহওয়াল তথা আধ্যাত্মিক অবস্থা-ই বা কী হবে। অতএব, এসব বই আধ্যাত্মিক অবস্থা-সংক্রান্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ'র অংশকেই সংরক্ষণ করেছে বটে।

এসব তথ্য কাদের জানা প্রয়োজন? বস্তুতঃ সকল মুসলমানেরই জানা প্রয়োজন, কেননা কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াত ও সহীহ হাদীস শরীফ এ বাস্তবতাকেই কেবল নির্দেশ করে না যে মুসলমানদেরকে কিছু নির্দিষ্ট আমল পালন তথা ধর্মীয় অনুশীলনী চর্চা করতে হবে এবং কিছু নির্দিষ্ট কথা বা বাক্য আওড়াতে হবে, বরং এ-ও নির্দেশ করে যে তাঁদেরকে নির্দিষ্ট উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা অর্জন করতে হবে এবং (মন্দ) আত্মিক অবস্থাগুলো দূর করতে হবে। আমরা কি আল্লাহ ভিন্ন আর কাউকে ভয় পাই? আমাদের অন্তরে কি অহঙ্কারের এক অণুকণা-ও বিরাজমান? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আমাদের মহব্বত (ভালোবাসা) কি অন্য যে কোনো মানুষের চেয়েও বেশি? আমাদের নেক আমল পালনে কি সামান্যতম প্রদর্শনীও বিদ্যমান?

কোনো মুসলমান ব্যক্তি আধ-মিনিটখানেক আত্মবিশ্লেষণাত্মক চিন্তা করলেই নিজ ধর্মের (ওপরোক্ত) এসব বিষয়ে নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হতে সক্ষম হবেন; আর তিনি এ-ও বুঝতে পারবেন কেন ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদেরকে এসব আধ্যাত্মিক মকাম (পর্যায়) অর্জনে সহায়তা করার কাজ আনাড়ীদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়নি, বরং অন্তর-বিশেষজ্ঞ তথা তাসাউফের উলামাবৃন্দের হাতে তার দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছিল। বেশির ভাগ মানুষেরই বদ-অভ্যাসগত কারণে, নিজেদের প্রবঞ্চিত করার সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচের দরুন এ পরিবর্তন সাধন সহজ হয় না; তবে সর্বোপরি, আমাদের প্রত্যেকেরই মাঝে বিরাজ করছে এক একগুঁয়ে সত্তা, এক কুপ্রবৃত্তি, যাকে আরবীতে বলা হয় 'আন্ নাফস্' এবং যার অস্তিত্ব সম্পর্কে আল্লাহ পাক সাক্ষ্য দেন সূরা ইউসূফে وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ অর্থাৎ, নিশ্চয় (কু)-প্রবৃত্তি তো মন্দকর্মেও বড় নির্দেশদাতা।[৬৮]

৬৮. আল কুর'আন : ইউছুফ, ১২/৫৩।

আপনাদের যদি ওপরোক্ত আয়াতে বিশ্বাস না হয়, তাহলে সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস শরীফটি বিবেচনা করতে পারেন, যা'তে বিবৃত হয়:

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ

পুনরুত্থান দিবসে প্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে, সে গযওয়ায় (ধর্মযুদ্ধে) নিহত একজন।

ওই লোককে আল্লাহর সামনে আনা হলে তাকে তিনি তাঁর প্রদত্ত নানা আশীর্বাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সে তা স্বীকারও করবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, "সেগুলোর ব্যাপারে তুমি কী করেছো?" ওই লোক তখন জবাবে বলবে, "আমি আপনারই খাতিরে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছি।"

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যুত্তর দেবেন, "তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি যুদ্ধ করেছো যাতে বীর বলে তোমার (উচ্চসিত) প্রশংসা করা হয়, আর তা ইতোমধ্যেই করা হয়েছে।" এরপর তাকে দণ্ড দেয়া হবে এবং মুখ থুবড়ে পড়া অবস্থায় টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে

অতঃপর আরেক লোককে হাজির করা হবে; সে ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করেছিল, তা অন্যান্যদের শিক্ষাও দিয়েছিল এবং কুরআন তেলাওয়াত-ও করেছিল। আল্লাহ পাক তাকেও তাঁর উপহৃত ঐশী করুণাধারার কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন, আর সে তা স্বীকারও করবে। এরপর মহান প্রভু বলবেন, "সেগুলোর ব্যাপারে তুমি কী করেছো?" লোকটি জবাব দেবে, "আমি আপনারই খাতিরে ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করেছি, তা শিক্ষা দিয়েছি এবং কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করেছি।"

আল্লাহ তা'আলা বলবেন, "তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি জ্ঞানার্জন করেছো যাতে তোমাকে আলেম বলা হয়; কুরআন তেলাওয়াত করেছো যাতে তোমাকে ক্বারী বলা হয়; আর তা ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে।" এরপর ওই লোককে দণ্ড দেয়া হবে এবং মুখ থুবড়ে পড়া অবস্থায় টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর আরেক লোককে সামনে হাজির করা হবে যাকে আল্লাহ পাক নানা ধরনের ধন-সম্পদ দ্বারা আশীর্বাদধন্য করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তা তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে সে-ও তা স্বীকার করবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ বলবেন, "সেগুলোর ব্যাপারে তুমি কী করেছো?" লোকটি উত্তর দেবে, "আপনি পছন্দ করেন এমন কোনো একটি ব্যয়-ও আমি বাদ রাখিনি, আর তা আপনারই খাতিরে খরচ করেছি।"

এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা বলবেন, "তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি তা করেছো যাতে তোমাকে দাতা বলা হয়, আর তা ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে।" এরপর ওই লোককে দণ্ড দেয়া হবে এবং মুখ থুবড়ে পড়া অবস্থায় টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।।[৬৯]

এ বিষয়ে আত্মপ্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়া আমাদের উচিত হবে না, কেননা আমাদের তাকদীর বা ভাগ্য এর ওপরই নির্ভর করছে। শৈশবকালে আমাদের পিতামাতা প্রশংসা বা দোষারোপের সময়ে আমরা কীভাবে আচরণ করবো, তা আমাদের শিখিয়েছিলেন; আর এটি আমাদের অধিকাংশেরই কর্ম সংঘটনের পুরো প্রেষণাকে (কোনো একটি খাতে) প্রবাহিত ও রংয়ে রঙ্গীন করেছে। কিন্তু শৈশবশেষে যখন আমরা

---

৬৯. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু মান কাতালা লির রিয়ায়ি, ৩/১৫১৩ হাদীস নং ১৯০৫।

ইসলামী বিধান জারির বয়সে পৌঁছি, তখন ওপরোক্ত হাদীস শরীফ ও "নেক আমলে তথা পুণ্যদায়ক কর্মের অনুশীলনে সামান্যতম প্রদর্শনীর মানে হলো আল্লাহর সাথে অন্যান্য সত্তার অর্চনা করা", মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উচ্চারিত এ বাণীর দ্বারা ইসলাম ধর্ম আমাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে অন্যান্যরা যেটিকে ভালো মনে করে তা আমাদের জন্যে যথেষ্ট নয়; আর এ-ও ব্যক্ত করে যে আমাদের প্রেরণার সামগ্রিক পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন; আর এ প্রেরণা অন্য কোনো কিছুর দ্বারা নয়, বরং একমাত্র আল্লাহরই রেযামন্দি হাসিলের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা হওয়া চাই। অতএব, ইসলামী বিধি-বিধান মুসলমানদের জ্ঞাত করে যে তাঁদের চিন্তাভাবনা ও প্রেরণার (চিরাচরিত) অভ্যেসকে পরিত্যাগ করা তাঁদের জন্যে বাধ্যতামূলক, কিন্তু তা কীভাবে করতে হবে সে কথা তাঁদেরকে তা জানায় না। এ বিষয়টি জানতে হলে মুসলমানদেরকে ওইসব আধ্যাত্মিক অবস্থার বিশেষজ্ঞ-উলামা তথা সূফী-দরবেশদের কাছে যেতে হবে, যেমনটি (ঐশী আজ্ঞার মাধ্যমে) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে কুরআন মজীদের নিম্নবর্ণিত আয়াতে করীমায়:

فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

–ওহে মানুষেরা, জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে।[৭০]

নিঃসন্দেহে এই পরিবর্তন সাধন, আত্মিক সততা ও নিষ্ঠা অর্জনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পরিশুদ্ধকরণ হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম প্রধান কর্তব্য; কেননা আল্লাহ পাক তাঁর কেতাবের সূরা আলে ইমরানে ঘোষণা করেন:

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ

–নিশ্চয় আল্লাহর মহা অনুগ্রহ হয়েছে মুসলমানদের প্রতি (এ মর্মে) যে, তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল

[৭০]. আল কুর'আন : আন নাহল, ১৬/৪৩।

প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের প্রতি তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র/পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞান) শিক্ষা দান করেন।[৭১]

ওপরের আয়াতে করীমায় নব্যুয়তের চারটি দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বিতীয়টি হচ্ছে "يُزَكِّيهِمْ", যার মানে 'তাঁদেরকে পবিত্র বা পরিশুদ্ধ করেন'। এর আর অন্য কোনো অর্থ তাফসীরে নেই। অতএব, এ কথাও স্পষ্ট যে চিরস্থায়ী ঐশী বিধানের অংশ হিসেবে এই শিক্ষাদানের কাজটি মুসলমানদের প্রথম প্রজন্ম বেসালপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়নি, যে বাস্তবতাটি আল্লাহ পাক তাঁর মহাগ্রন্থের সূরা লোকমানে প্রদত্ত ঐশী আজ্ঞায় নিশ্চিত করেছেন:

وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ

–আর তারই পথে চলো, যে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে।[৭২]

মুসলমানদের মাঝে যাঁরা ইসলামী বিধিবিধান প্রচার-প্রসার করার কাজে রত, এসব আয়াতে করীমা তাঁদের শিক্ষাদান ও (মুসলমানদের) রূপান্তরে ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করে; আর ওপরোল্লিখিত দ্বিতীয় আয়াতটিতে উদ্ধৃত "ٱتَّبِعْ" শব্দটি, যেটি অধিকতর সার্বিক, সেটি কোনো (আধ্যাত্মিকতার পাঠদাতা) শিক্ষকের সোহবত তথা সান্নিধ্যে থাকার পাশাপাশি তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ-অনুকরণকেও ইঙ্গিত করে। এ কারণেই তাসাউফ-চর্চার ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, অসংখ্য এতদসংক্রান্ত তরীকাহ বা অনুশীলন-পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও এ দুটি বিষয় কখনোই পরিবর্তিত হয়নি: ১/ কোনো শায়খ বা মোর্শেদের সান্নিধ্য লাভ; এবং ২/ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ, ঠিক যেমনটি সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত দ্বারা ও তাঁরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক উন্নতির শিখরে আরোহণ ও আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ করেছিলেন।

[৭১]. আল কুর'আন : আলে ইমরান, ৩/১৬৪।
[৭২]. আল কুর'আন : লুকমান, ৩১/১৫।

এ কারণেই কোনো নির্দিষ্ট সূফী শায়খের অধীনে থেকে তরীকাগুলো তাসাউফ-শাস্ত্রের সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসার করে আসছে। প্রথমতঃ এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরিত (অন্তরসমূহ) পবিত্রকরণের সুন্নাহ, যা আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ইসলামী জ্ঞান কখনোই শুধুমাত্র লেখনীর মাধ্যমে প্রচারিত হয়নি, বরং উলামাবৃন্দের কাছ থেকে তাঁদের শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। তৃতীয়তঃ এ জ্ঞানের ধরন হচ্ছে 'আহওয়াল' তথা অন্তরের অবস্থাসংক্রান্ত এবং তা শুধু জানার সাথে সম্পর্কিত নয়; তাই এ জ্ঞানশিক্ষার পূর্বশর্ত হচ্ছে জীবিত পীর-মোর্শেদবৃন্দের এমন এক পরম্পরা (সিলসিলা) থেকে তা গ্রহণ করা, যাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ফেরত গিয়েছেন। কেননা, ওপরোল্লিখিত আয়াতে কার্যকরভাবে শর্তারোপকৃত স্রেফ অন্তরের আহওয়ালের ব্যাপ্তি ও সংখ্যা এতোই যে, তা (আধ্যাত্মিকতার পাঠদাতা)-শিক্ষকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ-অনুকরণকেই কার্যকরভাবে এক্ষেত্রে একমাত্র প্রচারের মাধ্যম করে দিয়েছে।

এ যাবত আমরা ইসলাম-ধর্মের প্রেক্ষিতে তাসাউফ সম্পর্কে আলোচনা করেছি, যা কারো জীবনে ঐশী বিধি-বিধানের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্যে, কুরআন-হাদীসে দাবিকৃত অন্তরের আহওয়াল (অবস্থা) অর্জনের জন্যে অতি প্রয়োজনীয় ইসলামী শরীয়তের এক বিদ্যাশাস্ত্র। মালেকী মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বাণীতে শরীয়ত ও তাসাউফের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে; তিনি বলেন, "ফেকাহ তথা শরীয়তের আইন-কানুন শিক্ষা না করে যে ব্যক্তি তাসাউফ চর্চা করে, সে অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়; আর যে ব্যক্তি তাসাউফ চর্চা না করে ফেকাহ শিক্ষা করে, সে নিজেকে পথভ্রষ্ট করে। যে ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, সে-ই সত্যে উপনীত হয়।" এ কারণেই মালয়েশিয়া হতে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলমান দেশগুলোর মাদ্রাসাসমূহে পঠিত ঐতিহ্যবাহী পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে তাসাউফ-বিদ্যা শিক্ষা দেয়া হতো; আর এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ আলেম-উলামার অনেকেই ছিলেন সূফী-দরবেশ; আর গত শতাব্দীর শুরুতে ইসলামী খেলাফতের সমাপ্তি ও তৎপরবর্তী সময়ে মুসলমান রাজ্যগুলোর ওপর পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণ ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য

প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত লক্ষ্ণৌ হতে ইস্তাম্বুল ও মিসরে অবস্থিত উচ্চতর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তাসাউফের শিক্ষকবৃন্দ পাঠদান করতেন।

কিন্তু তাসাউফের দ্বিতীয় আরেকটি দিক সম্পর্কে আমরা এখনো আলোকপাত করিনি। তা হলো, (হাদীসে জিবরীলে বর্ণিত) ধর্মের দ্বিতীয় বিষয় 'প্রকৃত ঈমানের' সাথে তারই সম্পৃক্ততা; ইসলামী বিদ্যাশাস্ত্রগুলোর প্রেক্ষাপটে এই ঈমান হচ্ছে 'আকীদা-বিশ্বাসের' সমষ্টি।

সকল মুসলমান আল্লাহ পাকে বিশ্বাস করেন; অর্থাৎ, এ আকীদা-বিশ্বাস রাখেন যে তিনি মানব-মস্তিষ্কের ধারণাতীত বা কল্পনারও উর্ধ্বে; কেননা মানবের জ্ঞান-বুদ্ধি তার নিজের ইন্দ্রিয় ও তৎনিঃসৃত চিন্তাভাবনার প্রণালীসমূহে আবদ্ধ, যেমন না-কি সংখ্যা, দিকসমূহ, স্থানের ব্যাপ্তি, সময়কাল ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা এগুলোর সবকিছুরই উর্ধ্বে, যেমনটি তিনি এরশাদ ফরমান: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "তাঁর (আল্লাহ তা'আলার) মতো কিছুই নেই।"[৭৩]

এ আয়াত সম্পর্কে এক মুহূর্ত চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই, মুসলিম শরীফের ওই হাদীসে উল্লেখিত 'এহসান' অনুসারে "আল্লাহ তা'আলার এবাদত-বন্দেগী এমনভাবে করো যেন তাঁকে দেখছো" এই আদেশের অর্থ আমরা বুঝতে পারি যে 'দেখা' মানে চোখ দ্বারা দেখা নয়; কেননা চোখ শুধু তার নিজের মতোই পদার্থ বা বস্তু প্রত্যক্ষ করতে পারে; আর এর অর্থ মস্তিষ্ক-ও নয়, যেটি নিজের কল্পনার উর্ধ্বে ওঠে খোদায়ী তত্ত্ব উপলব্ধি করতে একেবারেই অক্ষম। বরঞ্চ এর অর্থ নিশ্চয়তাসূচক বিশ্বাস, ঈমানের নূর (জ্যোতি), যার সঠিক স্থান চোখ অথবা মস্তিষ্ক নয়, বরং 'রূহ' তথা আত্মা যেটি আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেকের মাঝে সৃষ্টি করে ফুঁকে দিয়েছেন, যেটির জ্ঞান-প্রজ্ঞা (খোদার) সৃষ্ট বিশ্বজগতের সীমা-পরিসীমা দ্বারা বাধাগ্রস্ত বা অবরুদ্ধ নয়। আল্লাহ তা'আলা এই রূহকে (ঐশী) রহস্যাবৃত রেখে এর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন; তিনি এরশাদ ফরমান:

---

৭৩. আল কুর'আন : আশ শু'য়ারা, ৪২/১১।

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى

–(হে রাসূল) বলুন, 'রূহ আমার রব্ব (প্রভু)-এর আদেশ থেকে এক বস্তু'।[৭৪]

এই রূহের (আত্মার) খোরাক হচ্ছে 'যিকর' বা 'আল্লাহ তা'আলার স্মরণ'। কেন? কারণ আনুগত্যপূর্ণ কাজ-কর্ম নিশ্চয়তাসূচক বিশ্বাসের আলো ও রূহের মধ্যে ঈমানদারি বৃদ্ধি করে; আর যিকর ওই ধরনের আমলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যা ইমাম আল-হাকীম নিশাপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক বর্ণিত এক সহীহ হাদীস দ্বারা সাবেত (প্রমাণিত) হয়; মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান:

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَأَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ ذِكْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

–আমি কি তোমাদের বলবো না তোমাদের সেরা আমল (অনুশীলন)-টি সম্পর্কে, যেটি তোমাদের প্রভুর দৃষ্টিতে সবচেয়ে খাঁটি/নির্মল, তোমাদের মর্যাদাবৃদ্ধিতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের, স্বর্ণ ও রৌপ্যদানের চেয়েও শ্রেয়, আর তোমাদের শত্রুদের মোকাবেলা ও তাদের ঘাড়ে আঘাত এবং তাদের দ্বারা তোমাদের ঘাড়ে প্রত্যাঘাতের (মানে জ্বেহাদের) চেয়েও শ্রেষ্ঠ?" সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম জিজ্ঞেস করেন, "এটি কী, এয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম?" তিনি জবাবে বলেন, "যিকরুল্লাহি 'আযযা ওয়া জাল্লা" মানে "সর্বশক্তিমান ও মহা-রাজকীয় আল্লাহ তা'আলার স্মরণ।[৭৫]

[৭৪]. আল কুর'আন : আল ইসরা, ১৭/৮৫।

[৭৫]. হাকিম : আল মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, কিতাবুত দু'য়া, ওয়াত তাকবীর ওয়াত তাহলীল, ১/৬৭৩ হাদীস নং ১৮২৫।

নেক আমল (পুণ্যময় কর্ম) এবং বিশেষ করে যিকিরের মাধ্যমে ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করা (মানে ঈমানকে সুদৃঢ় করা) ইসলাম ধর্ম ও সুন্নাহ-ভিত্তিক আধ্যাত্মিকতার জন্যে বড় ধরনের এক উপলক্ষ। জনৈক অ-মুসলিম একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "খোদা যদি অস্তিত্বশীল হয়েই থাকেন, তবে কেন এই তালবাহানা? তিনি কেন প্রকাশ্যে এসে তা ঘোষণা দেন না?"

এর উত্তর হলো, এ জীবনে তাকলিফ তথা 'নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য' শুধু বাহ্যিক আমলের সাথেই সম্পৃক্ত নয়, বরং তা আমাদের আকীদা-বিশ্বাস ও তার দৃঢ়তার সাথেও সম্পৃক্ত। এ দুনিয়ায় যদি আল্লাহ তা'আলা ও চির সত্য বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপন অনায়াসে হতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলার দ্বারা আমাদেরকে এর জন্যে দায়ী করার কোনো মানেই হতো না; এটি হতো অটোমেটিক বা আপনাআপনি, যেমন না-কি আমাদের বিশ্বাস লন্ডন শহরটি ইংল্যান্ডে অবস্থিত।

এমতাবস্থায় বিশ্বাস না করার মতো অসম্ভব কোনো বিষয়ের জন্যে কাউকে দায়ী করাটা একেবারেই অর্থহীন হতো।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যে দায়িত্ব আমাদের কাঁধে ন্যস্ত করেছেন, তা হলো গায়ব তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন, যা এ দুনিয়ায় আমাদের জন্যে কুফর ও ঈমানের মধ্যে পাথর্ক্য করতে এক পরীক্ষাস্বরূপ; আর অবিশ্বাসী হতে বিশ্বাসীদের পার্থক্য করতে এবং সমস্ত মুসলমান হতে কতিপয় ঈমানদারকে উচ্চ মর্যাদা দিতেও এটি একটি পরীক্ষা বটে।

এ কারণে যিকরের মাধ্যমে ঈমান সুদৃঢ়করণ তাসাউফ-শাস্ত্রের জন্যে এতোটাই পদ্ধতিগত গুরুত্ব বহন করে; মুসলমান হিসেবে আমাদেরকে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশ্বাস করতে আদেশ-ই শুধু দেয়া হয়নি, বরং তাতে পূর্ণ নিশ্চিয়তাসূচক আস্থা রাখতে আদেশও করা হয়েছে। আমাদের দেখা আশপাশের জগতটি আলো ও আঁধারের পর্দাসমূহের সমষ্টি; বিভিন্ন ঘটনার উদ্ভব হয়ে আমাদের কারো কারো ঈমান হারিয়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলা ধর্মের চিরসত্য বিষয়গুলোতে আমরা কতোটুকু নিশ্চিত বা সুদৃঢ় ঈমান রাখি, তার মাত্রা জনে জনে পরিমাপ করে থাকেন। তাই এই অর্থেই হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু বলেছিলেন, "যদি হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহ

তা'আলা আনহুর ঈমান গোটা উম্মতের ঈমানের মোকাবেলায় (পাল্লায়) পরিমাপ করা হতো, তবুও তাঁর ঈমান ভারী হতো।"

সুন্নী আকীদা-বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো 'ওয়াহদানীয়্যাত' বা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার 'একত্ব ও অনন্য বৈশিষ্ট্য'। এর মানে তাঁর পবিত্র সত্তা অথবা গুণাবলী কিংবা কর্মে কোনো শরীক বা অংশীদার নেই। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের বিশৃঙ্খল ও উদ্দাম লড়াইয়ে এই অন্তর্দৃষ্টি ধরে রাখার সামর্থ্য হচ্ছে অন্তরের এয়াকীন (নিশ্চিত বিশ্বাস)-ভিত্তিক শক্তি বা বলেরই একটি কাজ। আল্লাহ পাক তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল-কুরআনে বলেন:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

--হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি বলুন, 'আমি আমার নিজের ভালো-মন্দের মধ্যে খোদ-মোখতার (স্বাধীন) নই, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন (সে ঐশী ক্ষমতাবলে ক্ষমতাবান)।[৭৬]

তবু আমরা নিজেদের ওপর এবং আমাদের পরিকল্পনার ওপর নির্ভও করি, আর আকীদা-বিশ্বাসের বাস্তবতা সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে এ কথা ভুলে যাই যে আমাদের পরিকল্পনাগুলোর কোনো কার্যকারিতা-ই নেই এবং আল্লাহ তা'আলা একাই সব কিছুর ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছেন।

আপনি এ ব্যাপারে পরীক্ষা নিতে চাইলে এমন কারো কাছ থেকে সাহায্য নিতে চেষ্টা করুন যার (সমাজে বা রাষ্ট্রে) বড় বড় যোগাযোগের মানুষ আছে, যাদের সাহায্য আপনার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; ওই ধরনের ক্ষমতাবানদের কাছে ভালোভাবে তদবির করার জন্যে তাকে বলার মুহূর্তে নিজ বিবেকের দিকে খেয়াল করুন এবং দেখুন আপনি কার ওপর নির্ভর করছেন। আমাদের অধিকাংশের মতোই যদি আপনি

[৭৬]. আল কুর'আন : আল আ'রাফ, ৭/১৮৮। তাফসীরে নূরুল এরফান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ শানে নুযূল দেখুন, যা'তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারা হারিয়ে যাওয়া নিজ উটনীর খবর বলে দেন।

হয়ে থাকেন, মানে আল্লাহ আপনার চিন্তার অগ্রভাগে না থাকেন, যদিও বাস্তবতা হলো তিনি-ই সমস্ত বিষয়ের নিয়ন্তা, তাহলে এটি কি আপনার আকীদা-বিশ্বাসের ঘাটতি নয়? অন্ততঃ আপনার নিশ্চিত বিশ্বাসের মধ্যে এটি কমতি নয় কি?

তাসাউফ প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে আল্লাহর প্রতি এয়াকীন তথা নিশ্চিত বিশ্বাস ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করে এ ধরনের ঘাটতি মেটায় বা সংশোধন করে। আকীদা-বিশ্বাসের দাবিকৃত এয়াকীন অর্জনে তাসাউফের প্রধান দুটো মাধ্যম হলো মোযাকারা তথা ইসলামী বিশ্বাসের সুন্নাহ-ভিত্তিক মূলনীতিমালা শিক্ষা করা এবং যিকির তথা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ দ্বারা নিশ্চিত বিশ্বাসের সুদৃঢ়ীকরণ। এটি আমাদের ঈমানেরই অংশ, যেমনটি আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

–অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্মগুলোকেও।[৭৭]

তবু আমাদের কয়জনের জন্যে এ ব্যাপারটি প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাস্বরূপ বিদ্যমান? যেহেতু তাসাউফ তা'লিম (পাঠদান) ও যিকিরের এক নিয়মবদ্ধ পদ্ধতির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান দেয় এবং ঈমানী দুর্বলতা দূর করে, সেহেতু ঐতিহ্যগতভাবেই ধর্মের এই স্তম্ভটির (মানে ঈমানের) জন্যে এ বিদ্যাশাস্ত্রকে ব্যক্তি পর্যায়ে বাধ্যতামূলক বলে বিবেচনা করা হয়েছে; আর এ শাস্ত্র ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই নিজের যোগ্যতা বা যথার্থতা প্রমাণ করে এসেছে।

আজ রাতে আমাদের আলোচনায় শেষ যে প্রশ্নটির প্রতি আমরা দৃষ্টি দেবো তা হলো: আমাদের জানা ইসলামী শিক্ষার খেলাফ বা পরিপন্থী কর্ম-সংঘটনকারী 'সূফী'দের ব্যাপারে কী ফায়সালা?

এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে সূফী বলতে দুটো অর্থ: প্রথমটি "নিজেকে সূফী মনে করে এমন যে কেউ।" এটি সূফীতত্ত্বের প্রাচ্য-বিশারদ ইতিহাসবিদ ও জনপ্রিয় লেখকদের অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের পর প্রতিষ্ঠিত এক

[৭৭]. আল কুর'আন : সোয়ফ্-ফা-ত, ৩৭/৯৬ নং আয়াত; নূরুল এরফান।

পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া, যারা 'সূফী' বলতে 'উলামা'দের বিরোধী কাউকে বোঝান। আমি মনে করি, আজ রাতে প্রকৃত তাসাউফের পরিধি ও পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা যেসব কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ উল্লেখ করেছি, তা পরিস্ফুট করেছে কেন সূফীর নিম্নবর্ণিত সংজ্ঞা আমাদের কাছে প্রাধান্য পাবে: "শরয়ী বিধানে জ্ঞানী পুণ্যাত্মা যিনি যা জানেন তা-ই অনুশীলন করেছেন; অতঃপর আল্লাহ তাঁকে এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ দান করেছেন এমন জ্ঞান যা তিনি জানতেন না।"

ধর্মীয় জ্ঞানে শিক্ষিত একজন সূফী প্রথম যে জিনিসটি জানেন তা হলো, ইসলামী শরীয়ত ও আকীদা-বিশ্বাস সকল মানবের ঊর্ধ্বে। যে কেউ এ বিষয়টি না জানলে তিনি কখনোই সূফী হতে পারবেন না; তবে ব্যতিক্রম শুধু প্রাচ্যবিদের দৃষ্টিতে এ শব্দটির অর্থ, যার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কেউ কোনো স্টক এক্সচেঞ্জের সামনে দামী সূট-টাই পরে ব্রিফকেস্ হাতে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যেন সবাই মনে করেন তিনি একজন স্টক-ব্রোকার। কিন্তু প্রকৃত স্টক-ব্রোকার হওয়াটা একেবারেই আলাদা একটা ব্যাপার।

যেহেতু এই পার্থক্য আজকাল মুসলমান সমাজ এতদ্ভিন্ন সদ্ভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও অবহেলা করেন, সেহেতু এ কথাটি অহরহ ভুলে যাওয়া হয় যে আলেমদের মধ্যে যারা সূফীদের সমালোচনা করেছিলেন, যেমন ইবনুল জাওযী নিজ 'তালবিসে ইবলিস' (শয়তানের ধোকা) পুস্তকে, কিংবা ইবনে তাইমিয়্যা তার ফতোওয়ার বিভিন্ন স্থানে, অথবা ইবনে কাইয়্যেম জাওযিয়্যা, তারা সবাই কিন্তু শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাশাস্ত্রের শাখা হিসেবে তাসাউফের সমালোচনা করেননি। এর প্রমাণ হলো ইবনে জাওযীর প্রণীত পাঁচ খণ্ডের 'সিফাতুস্ সাফওয়া' শিরোনামের বইটি; এতে বিধৃত হয়েছে সেই একই সূফীদের জীবনী, যাঁদের সম্পর্কে ইমাম আল-কুশায়রী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিখ্যাত তাসাউফের কেতাব 'রেসালা-এ-কুশায়রীয়্যা'-তে লিখেছিলেন। ইবনে তাইমিয়্যা নিজেকে কাদেরীয়্যা সিলসিলার সূফী মনে করতো, আর তার রচিত ৩৭ খণ্ডে সমাপ্ত 'মজমু'আয়ে ফাতাওয়া' গ্রন্থের ১০ম ও ১১তম খণ্ডগুলো তাসাউফের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আর ইবনে কাইয়্যেম আল-জাওযিয়্যা ৩ খণ্ডের 'মাদারিজ আস্ সালেকীন' গ্রন্থটি লেখে আবদুল্লাহ আনসারী আল-হার'উয়ী'র সূফী তরীকার বিভিন্ন আধ্যাত্মিক মকাম-বিষয়ক

'মানাযিল আল-সা'য়েরীন' শীর্ষক বইয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হিসেবে। এসব লেখনী পরিস্ফুট করে যে এগুলোর লেখকদের কৃত সমালোচনা মূল তাসাউফশাস্ত্রের প্রতি ছিল না, বরং তাদের সময়কার নির্দিষ্ট কিছু দলের প্রতি-ই ছিল। আর ওই সমালোচনাকে ওর (খাস্) অর্থেই গ্রহণ করতে হবে।

অন্যান্য ইসলামী বিদ্যাশাস্ত্রের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়েছে, ঠিক তেমনি তাসাউফের ইতিহাসেও ভুলত্রুটি হয়েছে; এগুলোর বেশির ভাগই হয়েছে সবার ওপরে শরীয়ত ও আকীদা-বিশ্বাসের প্রাধান্য উপলব্ধি করতে না পারায়। কিন্তু এসব ভুল-ভ্রান্তি নীতিগতভাবে ভিন্ন ছিল না সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে, যা ঘটেছিল, উদাহরণস্বরূপ, তাফসীর-শাস্ত্রে অনুপ্রবিষ্ট ইসরাঈলীয়্যা (বনূ ইসরাঈল-সম্পর্কিত বানোয়াট কাহিনি)-এর ক্ষেত্রে, কিংবা হাদীস-শাস্ত্রে অনুপ্রবিষ্ট মওদুআত (জাল হাদীস)-এর বেলায়। কিন্তু তাফসীর-শাস্ত্র মন্দ বা হাদীস-শাস্ত্র বিচ্যুতিমূলক হওয়ার প্রমাণ হিসেবে এসব ভুলকে পেশ করা হয়নি, বরং প্রতিটি শাস্ত্রের বেলায়ই ওই শাস্ত্রবিদ ইমামবৃন্দ ভুল-ভ্রান্তি শনাক্ত করে ওগুলোর ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করেন; কেননা উম্মাহকে এর থেকে রেহাই দেয়া জরুরি ছিল। আর এ ধরনের সংশোধনী-ই আমরা ইমাম কুশায়রী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর 'রেসালা', ইমাম গাযযালী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর 'এয়াহইয়া' এবং সূফী মতাদর্শের অন্যান্য বইপত্রে দেখতে পাই।

ওপরে আমাদের উল্লেখিত সমস্ত কারণেই তাসাউফকে এ উম্মতের উলামাবৃন্দ ইসলাম ধর্মের অত্যাবশ্যক অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ হচ্ছেন তাসাউফেরই উচ্চতর জ্ঞানে জ্ঞানী ইসলামী শরীয়তের অন্যান্য বিদ্যাশাস্ত্রের আলেম-উলেমাবৃন্দ; এঁদের মধ্যে রয়েছেন সর্ব-ইমাম ইবনে আবেদীন শামী রহমতুল্লাহি আলাইহি, আল-রাযী, আহমদ ফারূকী সেরহিন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি, যাকারিয়্যা আনসারী, ইযয ইবনে আব্দিস্ সালাম রহমতুল্লাহি আলাইহি, ইবনে দাকিক আল-ঈদ, ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী রহমতুল্লাহি আলাইহি, শাহ ওলীউল্লাহ, আহমদ দারদির, ইবরাহীম আল-বাজুরী, আবদুল গনী নাবলুসী রহমতুল্লাহি আলাইহি, আন্ নববী রহমতুল্লাহি আলাইহি, তকীউদ্দীন সুবকী রহমতুল্লাহি আলাইহি, আস্ সৈয়ুতী রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ।

সূফী-মণ্ডলী যাঁরা ইসলামের খেদমতে কলমের পাশাপাশি তরবারিও ব্যবহার করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে 'উমদাত আস্ সালেক' (খোদার পথের পথিকবৃন্দের ভরসা/শায়খ নূহ হা মিম কেলার অনূদিত Reliance of the Traveler) শীর্ষক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে:

এ ধরনের পুণ্যাত্মাবৃন্দ হলেন নকশবন্দী (সিলসিলার) শায়খ শামিল দাগেস্তানী রহমতুল্লাহি আলাইহি, যিনি ১৯শতকে ককেশাস্ অঞ্চলে রুশদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যুদ্ধ করেছিলেন; সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সোমালী, সালেহীয়্যা সিলসিলার শায়খ যিনি ১৮৯৯ হতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত বৃটিশ ও ইতালীয়দের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন; কাদেরীয়্যা তরীকার শায়খ উসমান ইবনে ফদী, যিনি ১৮০৪ হতে ১৮০৮ সাল পর্যন্ত ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার জন্যে উত্তর নাইজেরিয়ায় জ্বেহাদ পরিচালনা করেছিলেন; কাদেরীয়্যা সিলসিলার শায়খ আবদুল কাদের জাযা'ইরী, যিনি ১৮৩২ হতে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আলজেরীয়দের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন; দারকাউয়ী (সিলসিলার) ফকীর আলহাজ্জ মুহাম্মদ আল-আহরাশ, যিনি ১৭৯৯ সালে মিসরে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন; তিজানী (সিলসিলার) শায়খ আলহাজ্জ উমর তাল, যিনি গিনী, সেনেগাল ও মালি অঞ্চলে ১৮৫২ হতে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত ইসলামী জ্বেহাদ পরিচালনা করেছিলেন; এবং কাদেরী (সিলসিলার) শায়খ মা'আল-আয়নাঈন আল-ক্বালক্বামী, যিনি ১৯০৫ হতে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত উত্তর মৌরিতানিয়া ও দক্ষিণ মরক্কোয় ফরাসীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

ধর্ম প্রচারের দ্বারা গোটা অঞ্চলসমূহকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে এসেছিলেন যে সকল পুণ্যাত্মা, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সানুসিয়্যা সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ মুহাম্মদ আলী সানুসী, ১৮০৭ হতে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত যাঁর প্রচেষ্টা ও জ্বেহাদ দ্বারা লিবিয়ার মরু এলাকা ও আফ্রিকী সাব-সাহারা অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়; আরও রয়েছেন শাযিলী (সিলসিলার) শায়খ মুহাম্মদ ফারূক ও কাদেরী শায়খ উবায়স আল-বারাউয়ী, যাঁদের প্রচেষ্টায় পূর্ব আফ্রিকী উপকূল

এলাকা হতে পশ্চিম দিকে এবং সমুদ্র-দূরবর্তী অঞ্চলে ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়। [Reliance of the Traveler, ৮৬৩ পৃষ্ঠা]।

এ সকল পুণ্যাত্মার দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট হয় কোন্ ধরনের (মহান) মুসলমানবৃন্দ সূফী ছিলেন; অর্থাৎ, (তাঁরা) সব ধরনেরই (ছিলেন), আর তাঁরা সবার এবং সব কিছুর ওপরই প্রভাব ফেলেছিলেন আর তাসাউফ তাঁদের সাধ্যানুযায়ী ইসলামের খেদমতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

অতএব, আজ রাতে আমার প্রভাষণের সার-সংক্ষেপ হলো: প্রথমে তাসাউফ ও শরীয়তের দিকে নজর দিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি যে অনেক কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ মুসলমানদেরকে নিজেদের অন্তরের হারাম অবস্থা (আহওয়াল) যেমন দম্ভ, হিংসা, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে ভয় করা ইত্যাদি দূর করতে আদেশ দেয়; পক্ষান্তরে, করুণা, মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত ও স্নেহ-মমতা, নামাযে অন্তরের একাগ্রতা এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার মতো অন্তরের আহওয়াল (অবস্থা) অর্জনের জন্যেও তা আদেশ করে। আমরা দেখতে পেয়েছি যে এসব অন্তরের অবস্থার বর্ণনা ফেকাহ'র বই-পুস্তকে খুঁজে পাওয়া যায় না, যেগুলোর উদ্দেশ্য-ই হলো (শুধু) শরীয়তের বাহ্যিক ও পরিমাপযোগ্য বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্ট করা। অথচ এই আহওয়ালের জ্ঞান প্রত্যেক মুসলমানের জন্যেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এ কারণেই এটি এহসান-বিশারদ তথা তাসাউফের শিক্ষকদের অধীনে শেখা হয়েছে ইসলামী ইতিহাসের সকল অধ্যায়েই, বর্তমান শতকের প্রারম্ভ অবধি।

অতঃপর আমরা ঈমানের পর্যায়ে নজর দিয়েছি এবং দেখেছি, যদিও এ জগতে আল্লাহ তা'আলা একাই সব কিছুর ওপর প্রভাব বিস্তার করেন বলে মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে, তবুও দৈনন্দিন জীবনে এ কথা মনে রাখাটা মানব সচেতনতার অর্পিত কোনো কিছু নয় (মানে মানুষ সজ্ঞানে এটি মনে রাখতে অক্ষম), বরং এটি মুসলমানের এয়াকীন তথা নিশ্চিত বিশ্বাসেরই একটি ক্রিয়া। আর আমরা দেখতে পেয়েছি আকীদা-বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যার শাখা হিসেবে তাসাউফ-শাস্ত্র মোযাকারা তথা 'আকীদা-বিশ্বাস শিক্ষাদান' ও যিকর তথা 'আল্লাহ পাকের স্মরণ' এই উভয় পন্থায় ওই এয়াকীনের (নিশ্চিত

বিশ্বাসের) সুশৃঙ্খল বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে থাকে; আর তা দিয়ে থাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উচ্চারিত এহসান-সম্পর্কিত বাণীর সাথে সঙ্গতি রেখেই, যেমনটি তিনি এরশাদ করেন, أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ "আল্লাহ তা'আলার এবাদত এমনভাবে করো যেন তুমি তাঁকে দেখছো।"[৭৮]

সবশেষে, আমরা দেখতে পেয়েছি, ইবনে আল-জাওযী ও ইবনে তাইমিয়্যার মতো আলেম-উলেমা তাসাউফের প্রতি যে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন, তা নীতিগতভাবে তাসাউফের প্রতি ছিল না, বরং তা ছিল তাদের সময়কার কিছু নির্দিষ্ট দল বা ব্যক্তির প্রতি উদ্দেশ্যকৃত, যার প্রমাণ ওই একই লেখকদের অন্যান্য বইপত্রে বিধৃত, যেখানে তারা তাসাউফকে শরীয়তেরই একটি জ্ঞানের শাখা হিসেবে স্বীকার করেছেন।

আজ রাতে আমার প্রভাষণ যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম তাতে ফিরে গিয়ে বলতে হয়, এই উম্মতের মধ্য হতে (প্রকৃত) ইসলামী উলামাদের হারিয়ে যাওয়ার ফলে বর্তমানে তাসাউফের দুটি একদম ভিন্ন চিত্রের উদয় হয়েছে। গত শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক শাসন দ্বারা সুন্নী ইসলামের অবকাঠামো ভেঙ্গে ফেলার পরবর্তীকালে লিখিত বইপত্র পড়লে আমরা দেখতে পাই মস্ত বড় এক ধোকা তাতে বিদ্যমান, আর তা হলো: আধ্যাত্মিকতাবিহীন ইসলাম ও তাসাউফ-হীন শরীয়ত। কিন্তু যদি আমরা ইসলামী বিদ্বানদের সনাতন বা ঐতিহ্যবাহী পুরোনো বইপত্র পড়ি, তাহলে তা থেকে আমরা জানতে পারি যে ইসলামের ইতিহাসজুড়ে তাফসীর, হাদীস বা অন্যান্য শাস্ত্রের মতোই শরীয়তের

[৭৮]. বুখারী : আস সহীহ, বাবু কাওলিহি, ইন্নাল্লাহা ইনদাহা ইলমুন, ৬/১১৫ হাদীস নং ৪৭৭৭।
(ক) মুসলিম : আস সহীহ, বাবু মা'রিফাতিল ঈমান ওয়াল ঈমান, ১/৩৬ হাদীস নং ৮।
(খ) ইব্ন মাজাহ : আস সুনান, বাবুল ঈমান, ১/২৪ হাদীস নং ৬৩।
(গ) আবূ দাউদ : আস সুনান, বাবু ফিল ক্বদরি, ৪/২২৩ হাদীস নং ৪৬৯৫।
(ঘ) তিরমিযী : আস সুনান, ৪/৩০৩।
(ঙ) নাসায়ী : আস সুনান, ৮/৯৭, বাবু না'তিল ইসলাম, হাদীস নং ৪৯৯০।
(চ) আহ্মদ : আল মুস্নাদ, ১/৩৯৫।
(ছ) বায্যার : আল মুস্নাদ, ২/৯৯।
(জ) ইব্ন হিব্বান : আস সহীহ, ১/৩৭৫ হাদীস নং ১৫৯।

একটি বিদ্যাশাস্ত্র হিসেবে বিরাজমান ছিল তাসাউফ। আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান:

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ.

–নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও কর্ম।[৭৯]

আর এটি-ই সবচেয়ে বড় আশার বাণী ইসলাম বর্তমান আধুনিক বিশ্বকে শোনাতে পারে, যে আধুনিক জগত বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদের দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইসলাম প্রকৃতপ্রস্তাবেই ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের ধর্ম হিসেবে বাহ্যতঃ একদিকে যেমন পারলৌকিক মুক্তির আশা, অপরদিকে তেমনি তা আত্মিকভাবে সরাসরি খোদায়ী মহব্বত তথা ঐশীপ্রেম ও উদ্ভাসনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাও।

[৭৯]. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু তাহরিমি জুলমিল মুসলিমি, ৪/১৯৮৬ হাদীস নং ২৫৬৪।
(ক) আহ্মদ : আল মুস্নাদ, ২/২৮৫।
(খ) ইব্ন হিব্বান : আস সহীহ, ২/১১৯ হাদীস নং ৩৯৪।
(গ) ত্বরানী : মু'জামুল কাবীর, ৩/২৯৭ হাদীস নং ৩৪৫৬।
(ঘ) বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, ১৪/৩৪১।
(ঙ) বায়হাকী : শু'য়াবুল ঈমান, ৭/৫০৮ হাদীস নং ৩২৯২।

[তিন]

তাসাউফের অর্থ ও তাৎপর্য

Tasawwuf's meaning and significance

(চিশ্‌তীয়া তরীকার বিশেষ রেফারেন্সসহ)

শায়খ সিরাজ হেনড্রিকস (দক্ষিণ আফ্রিকা)

ইসলাম ধর্মের বিশিষ্ট বুযূর্গানে দ্বীনবৃন্দ বিভিন্নভাবে তাসাউফের (সূফীতত্ত্বের) সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। সুলতানুল আরেফীন শায়খ সেহাবউদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রণীত আওয়ারিফুল মা'আরিফ (গোপন রহস্যের সুরভি) গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে তাসাউফ সম্পর্কে সহস্রাধিক সংজ্ঞা বিদ্যমান। তবে এ সব সংজ্ঞার কয়েকটির দিকে দ্রুত দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে এগুলো মূলত শব্দ ও তাকিদের ক্ষেত্রেই ভিন্নতা বহন করছে। এ প্রবন্ধের প্রয়োজনে আমরা এমনি তিনটি সংজ্ঞা এখানে পেশ করবো:

শায়খ আবু বকর শিবলী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাসাউফের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "এর প্রারম্ভে রয়েছে খোদা তা'আলার ভেদের রহস্য (মা'রেফত) এবং শেষে রয়েছে তাঁর একত্ব (তাওহীদ)।"

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "নিজ সত্তাতে মৃত কিন্তু খোদা তা'আলার মাঝে জীবিত"।

শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী বলেন, "সূফীবাদ শিক্ষা দেয় নিজ সত্তার পরিশুদ্ধি, নৈতিকতার উন্নতি এবং নিজ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জীবনকে গড়ে তোলা, যাতে করে চিরস্থায়ী আশীর্বাদ লাভ করা যায়। এর সারবস্তু হলো আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো চিরস্থায়ী কল্যাণ ও আশীর্বাদ লাভ।"

এই তিনটি সংজ্ঞা- যার প্রথমটি আকল্ তথা বুদ্ধিমত্তার সাথে সম্পৃক্ত, দ্বিতীয়টি হাল্ তথা ভাব বা আধ্যাত্মিক অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত এবং তৃতীয়টি আখ্‌লাক তথা নৈতিকতার সাথে সম্পৃক্ত- তাতে সূফী অন্বেষণের মৌলিক দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অতএব, প্রথম সংজ্ঞাটিতে বাস্তবতার চূড়ান্ত প্রকৃতি রূপায়িত হয়েছে এ মর্মে যে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়ায় ও ইচ্ছায়ই সকল বস্তু ও

জীব অস্তিত্বশীল। দ্বিতীয়টিতে নফসানীয়াত তথা কুপ্রকৃত্তি বা একগুঁয়ে সত্তাকে পরিত্যাগের গুরুত্বের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। দম্ভ, কপটতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা হলো আল্লাহ্ তা'আলা ও মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় পর্দা।

হযরত রাবেয়া আল্ আদাউইয়্যা রহমতুল্লাহি আলাইহি এই হাল বা ভাবোন্মত্ত অবস্থা সম্পর্কে বলেন, "আমি যদি আমার নিজ সত্তার ব্যাপারে মাগফেরাত কামনা করি, তাহলে আমাকে আবার ক্ষমা (মাগফেরাত) চাইতে হবে।" তিনি ব্যক্তি সত্তার (নফস্) স্বীকৃতিকেই সবচেয়ে বড় পাপ বিবেচনা করতেন। তৃতীয় সংজ্ঞাটির বিবেচ্য বিষয় হলো মানব সত্তাকে সর্বোত্তম নৈতিকতা ও মূল্যবোধ দ্বারা বিভূষিত করা। তাযকিয়া তথা আত্মিক পরিশুদ্ধি ও তাহলিয়্যা তথা বিভূষণের দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্ভব হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, সকল দূষণীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে সকল প্রশংসনীয় গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত হওয়া।

'সূফী' সংজ্ঞাটির উৎপত্তি

সূফী শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে অভিধান রচয়িতাবৃন্দ বেশ কিছু মূল শব্দকে চিহ্নিত করেছেন। সবচেয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত যে শব্দটি তা হলো 'সূফ', যার মানে সুতো, পশম। প্রাথমিক যুগের সূফীবৃন্দ দুনিয়া থেকে নিজেদের অসম্পৃক্ততা প্রকাশের জন্যে এবং বস্তুবাদকে প্রত্যাখ্যানের জন্যে সুতোর জামাকাপড় পরতেন।

অন্যান্য সংজ্ঞা মধ্যে রয়েছে–

সাফা, যার অর্থ পরিশুদ্ধি; সাফউইয়ী, যার মানে মনোনীত জন; সুফফা, যা কোনো নিচু বারান্দাকে বোঝায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যমানায় কিছু সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম নিজেদেরকে দুনিয়াবী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরিয়ে কৃচ্ছতাপূর্ণ জীবন যাপন করতে থাকেন। তাঁরা 'আসহাবে সুফফা' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদের পাশে একটি ছোট বারান্দায় তাঁরা খোদার ধ্যানে সর্বদা মগ্ন থাকতেন।

সাফ্ফ, যার অর্থ সারি, লাইন। নামাযে প্রথম কাতার বা সারিকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে, কেননা তা আধ্যাত্মিকতায় প্রথম সারিকে প্রতীকায়িত করে।

শব্দের উৎপত্তি ও ইতিহাস সংক্রান্ত বিজ্ঞান অনুযায়ী যে শব্দটি উৎস হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেছে তা হলো 'সুফ'। তথাপি অন্যান্য শব্দগুলোকেও সাধারণত এতদসংক্রান্ত আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে; এর একমাত্র হলো এই যে সূফী তরীকার বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের কোনো না কোনো একটিকে এগুলো প্রতিফলন করে।

তাসাউফের উৎসসমূহ

তাসাউফ ইসলাম ধর্মবহির্ভূত উৎস থেকে আবির্ভূত হয়েছে– এটা দেখাতে পূর্ববর্তী প্রাচ্যদেশ-সম্পর্কিত গবেষণাগুলো যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেছিল। এ সব গবেষণা অনুযায়ী, 'ইসলাম ধর্ম আরবের শুকনো পতিত জমি থেকে এসেছিল, আর তাই তাতে কখনোই এতো গভীর ও অনুপ্রেরণাদায়ক জ্ঞানের বীজ অন্তর্নিহিত থাকতে পারে না; সূফীদের আশীর্বাদপুষ্ট অন্তর্দৃষ্টির শেকড় কোনোক্রমেই মরুভূমিতে প্রোথিত হতে পারে না'। এই একপেশে নীতির কারণে অনেক পশ্চিমা গবেষক কুরআনে ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে নিহিত অন্তর্দৃষ্টি ও দিব্যজ্ঞান সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারেন নি। তবে সূফীবাদ সংক্রান্ত কুরআনী উৎসগুলো সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

সূফীবৃন্দ তাঁদের অবস্থানের পক্ষে আল কুরআনের যে দলিলাদি পেশ করেন, তার মধ্যে সূরা ওয়াকিয়াহর আয়াতে করীমাগুলো প্রণিধানযোগ্য। এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষদেরকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

১. আসহাব আল মাশআমাহ্ তথা বাম হাতের দিকের মানুষ;
১. আসহাব আল্ মায়মানাহ্ তথা ডান হাতের দিকের মানুষ;
২. মুকাররাবুন তথা সেই সব বুযূর্গ যারা আল্লাহর নিকটবর্তী; এঁদেরকে 'অগ্রবর্তী' ও বলা হয়েছে।

প্রথম দলটি ঈমান গ্রহণ করেনি। দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত হলেন নেককার মুসলমানবৃন্দ যারা আল্লাহর প্রতি তাঁদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট। তাঁদের সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে–

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾

–পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এক দল এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকে এক দল।[৮০]

আর সর্বোপরি রয়েছেন মুকাররাবুন। তাঁরা হলেন মু'মেন বান্দাদের মধ্যে এমনি একটি বিশেষ দল, যাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছেন। তাঁদেরকে বেশির ভাগ সময় খাওয়াস্ আল্ খাসওয়াস্ তথা মনোনীতদের মাঝে মনোনীত বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এঁদের ঈমানের প্রাচুর্যই এঁদেরকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের মকাম বা মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

সূরা ওয়াকিয়াহতে এই বুযূর্গদের সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে:

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾

–পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে একদল; এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক।[৮১]

এই উচ্চমার্গের ঈমান ও আধ্যাত্মিক উন্নতিই সূফীবৃন্দের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণিত একটি হাদীসে কুদসীতেও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান–

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي

[৮০]. আল কুর'আন : আল ওয়াকিয়াহ, ৫৬/৩৯-৪০।
[৮১]. আল কুর'আন : আল ওয়াকিয়াহ, ৫৬/১৩।

بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.

অর্থ: আমার বান্দা নফল (তরীকার রেয়াযত) এবাদত-বন্দেগী দ্বারা আমার এতো নিকটবর্তী হন যে আমি তাঁকে ভালোবাসি; এতো ভালোবাসি যে আমি তাঁর কুদরতী কান হই যা দ্বারা তিনি শোনেন; তাঁর কুদরতী চোখ হই যা দ্বারা তিনি দেখেন; আমি তাঁর কুদরতী হাত হই যা দ্বারা তিনি কাজকর্ম করেন এবং তাঁর কুদরতী পা হই যা দ্বারা তিনি চলাফেরা করেন"।[৮২]

আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও তাঁর ভালোবাসার সাথে যখন তাঁর সৌন্দর্যের বিষয়টি যুক্ত হয়, যেমনিভাবে হাদীস্ শরীফে বর্ণিত হয়েছে- إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা নিজে সুন্দর এবং সুন্দরকেও ভালোবাসেন"[৮৩], তখন সূফী-দরবেশ রাবেয়া আল্ আদাউইয়্যার (রহমতুল্লাহি আলাইহি) কথার মর্মও বোধগম্য হয়; তিনি বলেছিলেন- "হে আল্লাহ্! আমি দোযখের ভয়ে আপনার এবাদত করে থাকলে আপনি আমায় তাতে পুড়িয়ে খাক করে দিন; আর যদি বেহেশতের আশায় এবাদত করে থাকি, তবে তা থেকে আমায় বঞ্চিত করে দিন; কিন্তু আপনার খাতিরে যদি আমি আপনার বন্দেগী করে থাকি, তাহলে আপনার চিরস্থায়ী সৌন্দর্য দর্শন থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না"!

এই আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার আলোকেই আমরা সূফীবৃন্দের বিভিন্ন ভক্তিমূলক কর্মকাণ্ডের ঐকান্তিকতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো।

পূর্ববর্তী যুগের সূফীবৃন্দের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন হযরত হাসান আল্ বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি (বেসাল ৭২৪ খৃষ্টাব্দ), হযরত ইবরামীম ইবনে আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহি (বেসাল ৭৭৭ খৃষ্টাব্দ), হযরত রাবেয়া আল্ আদাউইয়্যা রহমতুল্লাহি আলাইহি (বেসাল ৮০১

[৮২]. বুখারী : আস সহীহ, বাবুত তাওয়াদ্বউ, ৮/১০৫ হাদীস নং ৬৫০২।
(ক) বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, ৫/১৯ হাদীস নং ১২৪৭।
[৮৩]. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু তাহরিমিল কিবার ওয়া বয়ানিহি, ১/৯৩ হাদীস নং ৯১।
(ক) মিশকাতুল মাসাবীহ : ১/৫৫৮ হাদীস নং ১৭৭৮।

খৃ:), হযরত ফুযাইল ইবনে আয়ায রহমতুল্লাহি আলাইহি (বেসাল ৮০৩ খৃষ্টাব্দ), হযরত মা'রূফ কারখী রহমতুল্লাহি আলাইহি (বেসাল ৮১৫ খৃষ্টাব্দ), হযরত আবু আব্দুল্লাহ্ আল্ মুহাসিবী রহমতুল্লাহি আলাইহি (বেসাল ৮১৫ খৃষ্টাব্দ), হযরত সিররী সাকাতী রহমতুল্লাহি আলাইহি (বেসাল ৮৬৭), হযরত বায়েযীদ বোস্তামী (রহমতুল্লাহি আলাইহি (বেসাল ৮৭৪ খৃষ্টাব্দ) এবং হযরত আবুল কাসেম জুনাইদ আল্ বাগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি (বেসাল ৯১০ খৃষ্টাব্দ)।

পীর ও মুরীদের সম্পর্কের মাঝে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। প্রথমটি হলো ইলবাসুল খিরকা তথা জোড়াতালি দেয়া একটি জামা পরিধান যা মুরীদের তরীকায় বা তাসাউফে দাখিল হবার ইঙ্গিতবহ ছিল। দ্বিতীয় দিকটি তালকিনুয্ যিকর নামে জ্ঞাত, যার অর্থ হলো মুরীদ কী ধরনের যিকর পালন করবে সে সম্পর্কে পীরের নির্দেশ। তৃতীয় দিকটিকে সোহবত বলে, যা পীরের সান্নিধ্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করে। এসব দিক প্রাথমিক যমানা থেকেই সূফী তরীকাহর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে চলে আসছে। বস্তুতঃ এসব আচারের অধিকাংশই রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের যিকরসহ সূফীবৃন্দের শিক্ষাসমূহ পীরের কাছ থেকে মুরীদের কাছে ধারাবাহিক পরম্পরায় হস্তান্তরিত হয়ে আসছে; এটিকে সিলসিলা বলে। এসব সিলসিলার মাধ্যমে এবং এজাযত প্রথার দ্বারা সূফীবৃন্দের শিক্ষাসমূহ আমাদের আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্যগত অংশ হিসেবে সংরক্ষিত হয়েছে। এজাযত হলো পীরের শিক্ষাসমূহ (তরীকা)-কে আরও প্রসারিত করার জন্যে মুরীদ (খলীফা)-কে পীরের দেয়া অধিকার।

সূফীবাদ তিন-ধারা বিশিষ্ট প্রক্রিয়া:

১. **শরীয়ত**- এটির বিধান সম্পর্কে জানা এবং তা কঠোরভাবে মেনে চলা;

২. **তরীকত**- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাসাউফের বরেণ্য ও বিজ্ঞ বুযূর্গবৃন্দের নির্দেশিত আধ্যাত্মিক প্রথার (যেমন যিকর) অনুশীলন বা চর্চা।

৩. হাকীকত- সেই আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি বা দিব্যদৃষ্টি লাভ যার দর্শন হলো সকল বস্তুই আল্লাহ্ তা'আলা থেকে আগত এবং তাঁরই মালিকানাধীন।

শরীয়ত ও তাসাউফ

ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক যুগে সূফী মতাদর্শ সম্পর্কে শরীয়তের কিছু আলেমের মনে বিভ্রান্তি দেখা দিলে সর্বজনমান্য ও স্বনামখ্যাত সূফী ও আলেমে দ্বীন ইমাম আবু হামিদ আল্ গাযযালী রহমতুল্লাহি আলাইহি ১০৫৭-১১১১ খৃষ্টাব্দ) তাঁর লেখনীর মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা ফিরিয়ে আনেন। ইসলাম ধর্মের ফেকাহ্ (বিধানবিষয়ক শাস্ত্র) ও সূফী (আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক দর্শন) ভাবধারার মধ্যে সুসমন্বয় সাধন তাঁর অমূল্য ও সফল কীর্তি। দুটোর কোনোটিকে প্রত্যাখ্যান করলে ইসলাম ধর্ম হাস্যস্পদ বস্তুতে পরিণত হয়।

চিশ্‌তীয়া তরীকা

ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে, বিশেষ করে স্থাপত্য, শিল্পকলা ও সাহিত্যে সূফী তরীকাগুলোর অবদান সুবিশাল। চিশ্‌তীয়া তরীকা হলো তেমনি একটি সূফী মতাদর্শ।

হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহির মাধ্যমে চিশ্‌তীয়া তরীকা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এই সিলসিলার মূলে হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি রয়েছেন। এই তরীকা আফগানিস্তানের চিশ্‌ত নগরীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

হযরত খাজা আজমেরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর তরীকার শিক্ষাসমূহ তাঁর সুযোগ্য খলীফা হযরত কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহঃ -বেসাল ১২৩৬ খৃষ্টাব্দ) কর্তৃক আরও প্রসার লাভ করে। তাঁর খলীফা হলেন আরেক সূফী প্রাণপুরুষ হযরত শায়খ ফরিদউদ্দীন গঞ্জে শাকর (রহমতুল্লাহি আলাইহি বেসাল ১২৬৫ খৃঃ)। তাঁর খলীফা মাহবুবে এলাহী হযরত নিযামউদ্দীন আউলিয়া (রহঃ বেসাল ১৩২৫ খৃঃ) ভারত উপমহাদেশে ও উত্তরে চীন দেশে চিশ্‌তীয়া তরীকাকে ব্যাপক প্রচার-প্রসার করেন। তিনি সূফীকুল শিরোমণি হওয়ার পাশাপাশি শরীয়তেরও বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তাঁকে যুগের আধ্যাত্মিক জগতের ইমাম বিবেচনা করা হতো।

উপসংহার

তাসাউফ ইসলাম ধর্মের আধ্যাত্মিক দিক ছাড়া আর কিছু নয়। পদ্ধতি হিসেবে তরীকা হলো ওই দিকটিকে সংরক্ষণ ও অর্জনের প্রয়াস। আর শরীয়ত হলো এমনি একটি ঐশী বিধান যার মধ্যে ওই আধ্যাত্মিকতা তার সুনির্দিষ্ট আকার তথা রূপ পরিগ্রহ করে। ইসলামের এই তিনটি অংশ গোটা ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছাড়া কিছু নয়।

ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি কী সুন্দর বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফেকাহ্ শিক্ষা করে কিন্তু তাসাউফকে অবহেলা করে, সে ধর্ম প্রত্যাখ্যানকারী হিসেবে সাব্যস্ত হয়; আর যে ব্যক্তি তাসাউফ শিক্ষা করে কিন্তু ফেকাহকে অবহেলা করে, সে বিচ্যুত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি দুটোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, সে অবশ্যই সত্যে পৌঁছুতে সক্ষম হয়।"

যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন তরীকার আবির্ভাব সম্পর্কে ঐতিহ্যবাহী একটি সূফী প্রবাদ আছে- "তাওহীদ (একত্ববাদ) এক, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলাকে পাবার রাস্তাসমূহ আদম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে আগত মানুষের সংখ্যার মতোই ভিন্ন ভিন্ন।" এই ভিন্ন ভিন্ন পথগুলোকে উম্মতে মুহাম্মদী আল্লাহ্ পাকের করুণা হিসেবে দেখে থাকেন।

[সংস্কৃত এই প্রবন্ধটি'র লেখক হলেন মক্কা মোকাররমার বিশিষ্ট শায়খ মুহাম্মদ আলাউয়ী মালেকীর ভাবশিষ্য। তিনি এবং তাঁর ছোট ভাই শায়খ আহমদ হেনড্রিকস্ মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সনদপ্রাপ্ত। এটি www.sunnah.org/tasawwuf/tasawwuf.htm শীর্ষক ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত হয়েছে।]

[চার]

তাসাউফ (সূফীতত্ত্ব)

শায়খ হিশাম কাব্বানী (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

"রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় তাসাউফ ছিল একটি বাস্তবতা যার কোনো নাম ছিল না। আজকে তাসাউফ হলো একটি নাম, কিন্তু এর বাস্তবতা সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানেন।"

বর্তমানে মুসলমান জাতির জন্যে প্রয়োজন এমন সুজ্ঞানী ব্যক্তিত্বদের যাঁরা ইসলামের সঠিক শিক্ষা অনুশীলন করেন (আ'লিমুন আ'মিল); যুগে যুগে ক্ষয়ে যাওয়া ইসলামী মূল্যবোধ ও সভ্যতা-সংস্কৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যাঁরা সাধ্যানুযায়ী সচেষ্ট এবং যাঁরা হক (সত্য) ও বাতেলের (মিথ্যার) মধ্যে, হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম; আর যাঁরা আল্লাহর পথে কাউকে ভয় না করেই হক্ক-এ বিশ্বাস করেন এবং বাতেলের বিরুদ্ধাচরণ করেন।

আজকের মুসলামান সমাজকে সত্য, সঠিক পথের দিকে, ধর্মের শিক্ষার দিকে পরিচালনা করার মতো আলেমের সংখ্যা নেই বল্লেই চলে। পক্ষান্তরে, আমরা এমন কিছু আলেমের দেখা পাই যারা ইসলাম সম্পর্কে জানার ভান করেন, অথচ ইসলামের নামে সবার ওপর নিজেদের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা চাপিয়ে দেবার চেষ্টায় রত থাকেন। তারা সকল সভা-সমিতি, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দান করেন এবং নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানের আলোকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে 'লেকচার' ও বয়ান দেন। এ ধরনের বক্তব্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, ইসলামের মহান ইমামদের সাথেও নয়, অধিকাংশ মুসলামানদের ঐকমত্যের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

আলেম-উলামা যদি নিজেদের বিবেকের কথা শুনতেন ও ইসলামের প্রতি অনুগত ও নিষ্ঠাবান হতেন, আর অর্থের জোরে মুসলমান দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন সরকার ও শক্তিগুলোর প্রভাবমুক্ত হয়ে শুধু দাওয়া ও ইরশাদের (প্রচার) কাজে নিয়োজিত হতেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্মরণে মশগুল থাকতেন, তাহলে ইস্লামী বিশ্বের পরিস্থিতি ও চেহারা পাল্টে যেতো

এবং মুসলমানদেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হতো। আমরা আশা করবো, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্ ও শরীয়তকে প্রতিষ্ঠা করতে আমেরিকাসহ সারা বিশ্বের মুসলমান একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবেন।

ইতিহাসকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে সাহাবায়ে কেরামের কঠিন পরিশ্রমের পরে পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার (দাওয়া ও ইরশাদ) ঘটেছিল তাসাউফ (সূফীবাদ)-এর জ্ঞানী বুযূর্গানে দ্বীন ও তাঁদের অনুসারীদের মাধ্যমে, যাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফাবৃন্দের সঠিক পথের অনুসারী ছিলেন। তাঁরা প্রকৃত সূফীবাদের আলেম ছিলেন, যে সূফী মতবাদ কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাসমূহ সমুন্নত রেখেছে এবং তা থেকে বিচ্যুত হয় নি।

ইসলামী যুহদ (কৃচ্ছ্রব্রত) প্রথম হিজরী শতকে বিকশিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন তরীকায় পরিণত হয়েছিল; এ সব তরীকার ভিত্তি ছিল কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা এবং এগুলো প্রচার করতেন যাহেদ উলামায়ে কেরাম যাঁরা পরবর্তীকালে সূফী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রথম চার ইমাম, যথা-ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম শাফেয়ী রহমতুল্লাহি আলাইহি, ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহি আলাইহি; আরও রয়েছেন ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ আল্ বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি, আবু হুসাইন মুসলিম বিন আল্ হাজ্জাজ রহমতুল্লাহি আলাইহি, আবু ঈসা তিরমিযী রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ। অতঃপর যাঁরা আগমন করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম হাসান আল্ বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আওযাঈ রহমতুল্লাহি আলাইহি। এঁদের পরে এসেছেন আত্ তাবারানী রহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম জালালউদ্দীন সৈয়ুতী রহমতুল্লাহি আলাইহি, ইবনে হাজর আল্ হায়তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি, আল্ জর্দানী, আল্ জওযী, ইমাম মহিউদ্দীন বিন শারফ বিন মারী বিন হাসান বিন হুসাইন বিন হাযম বিন নববী রহমতুল্লাহি আলাইহি, সৈয়দ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ। এসব যাহেদ আলেম তাঁদের আনুগত্য, নিষ্ঠা ও অন্তরের পরিশুদ্ধির কারণে সূফী হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন এবং

তাঁদের চেষ্টার ফলেই মুসলমান বিশ্ব আজকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।

আমরা এ তথ্যটি গোপন করতে চাই না যে, ওই সময় কিছু ইসলামের শত্রু সীমা লঙ্ঘন করে সূফীবাদের নামে ও সূফী হবার ভান করে প্রকৃত সূফী দর্শনকে ধ্বংস করার অসৎ উদ্দেশ্যে এবং মুসলমানদের মনকে সূফী দর্শনের প্রতি তিক্ত করার লক্ষ্যে নিজেদের মনগড়া মতবাদ পরিবেশন করেছিল। উল্লেখ্য যে, ওই সময় সূফী মতাদর্শ মুসলমানদের মধ্যে মূলধারা ছিল। প্রকৃত তাসাউফ যুহদ ও এহ্সান (অন্তরের পবিত্রতা)-এর ওপর ভিত্তিশীল। মুসলিম বিশ্বের মহান ইমামবৃন্দ যাঁদেরকে সকল মুসলমান দেশে অনুসরণ করা হতো, তাঁরা সূফী গুরু হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আবু হানিফা (যাঁর পীর ছিলেন ইমাম জা'ফর সাদেক-রহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম শাফেয়ী (যিনি শায়বান আর রায়কে পীর হিসেবে অনুসরণ করতেন) ও ইমাম হাম্বল (যাঁর মুরশিদ ছিলেন বিশর আল্ হাফী) সকলেই তাসউফকে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

মুসলমান দেশগুলোর সকল বিচারালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় অদ্যাবধি এই চার ইমামের মযহাবগুলোর শিক্ষার ওপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, মিসর, লেবানন, জর্দান, ইয়েমেন, জিবুতি ও আরও কিছু দেশ শাফেয়ী মযহাব অনুসরণ করে। সুদান, মরক্কো, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, মৌরিতানিয়া, লিবিয়া ও সোমালিয়া মালেকী মযহাবের অনুসারী। সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ওমান এবং আরও কিছু দেশ হাম্বলী মযহাব অনুসরণ করে। তুরস্ক, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং রুশীয় কিছু মুসলমান প্রজাতন্ত্রের দেশে হানাফী মযহাব অনুসরণ করা হয়। মুসলমান দেশগুলোর বিচারালয়ের অধিকাংশই এই চার মযহাবের ফতোওয়া অনুযায়ী চলে। আর এই চার মযহাবের সবগুলোই তাসাউফকে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর একটি বিখ্যাত বাণী আছে, যার মধ্যে তিনি বলেন- "মান তাসাওয়াফ্ফা ওয়া লাম ইয়াতাফাকাহা ফাকাদ তাযানদাকা; ওয়া মান তাফাকাহা ওয়া লাম ইয়াতাসাওয়াফা ফাকাদ তাফাসাক; ওয়া মান তাসাওয়াফ্ফা ওয়া তাফাকাহা ফাকাদ

তাহাকাক।" অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি ফেকাহ্ ছাড়া তাসাউফ শিক্ষা করে, সে যিনদিক তথা গোমরাহ-পথভ্রষ্ট হয়; আর যে ব্যক্তি তাসাউফ বাদ দিয়ে ফেকাহ্ শিক্ষা করে সে ফাসিক গুনাহ্গার হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি তাসাউফ ও ফেকাহ দুটোই শিক্ষা করে, সে সত্য ও ইসলামের বাস্তবতাকে খুঁজে পায়।"

ভ্রমণ করা যখন সবচেয়ে কঠিন ছিল এমনি এক সময়ে ইসলাম ধর্ম সূফী পর্যটকদের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় দ্রুত প্রসার লাভ করে; এই সূফীবৃন্দ এতো বড় মহান কাজের জন্যেই আল্লাহর পছন্দকৃত বান্দা হবার শর্ত যুহদ আদ্ দুনইয়া (কৃচ্ছ্রব্রত)-তে সুশিক্ষিত হয়ে গড়ে উঠেছিলেন। তাঁদের জীবনই ছিল দাওয়া, আর তাঁদের খাদ্য ছিল রুটি ও পানি। তাঁদের এই সংযম দ্বারা ইসলামের আশীর্বাদে তাঁরা পশ্চিম থেকে দূর প্রাচ্যে পৌঁছেছিলেন।

হিজরী ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে সূফী গুরুদের প্রচেষ্টা ও অগ্রগতির ফলে তাসাউফ ক্রমান্বয়ে বিকাশ লাভ করে। প্রতিটি সূফী তরীকা তার মুরশিদের নামে পরিচিতি লাভ করে, যাতে করে অন্যান্য তরীকা থেকে তাকে পৃথকভাবে চেনা যায়। একইভাবে আজকে প্রত্যেক ব্যক্তি যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী লাভ করেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিজ নামের সাথে বহন করেন। এটা নিশ্চিত যে ইসলাম ধর্ম একই থাকে, এক সূফী পীর থেকে অন্য সূফী পীরে কখনো পরিবর্তিত হয় না; ঠিক যেমনি ইসলামী শিক্ষা এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবর্তিত হয় না।

তবে, অতীতে শিক্ষার্থীরা (মুরিদরা) তাঁদের পীরের উন্নত নৈতিকতা ও আচার ব্যবহারে প্রভাবিত হতেন। সে কারণে তাঁরা একনিষ্ঠ ও অনুগত ছিলেন। কিন্তু আজকে আমাদের আলেম-উলামা সেই ধরনের দিক-নির্দেশনা দিতে অক্ষম এবং তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে শিখতে হচ্ছে অমুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে, অমুসলিম শিক্ষকদের কাছ থেকে।

সূফী গুরুগণ তাঁদের মুরিদদেরকে বলতেন আল্লাহ্ তা'আলাকে স্রষ্টা হিসেবে এবং তাঁর রাসূলকে তাঁরই হাবীব ও নবী হিসেবে গ্রহণ করতে; আরও নির্দেশ দিতেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত করতে এবং মূর্তি পূজা পরিহার করতে; খোদা তা'আলার কাছে তওবা করতে; নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্ অনুসরণ করতে; আর নিজেদের অন্তর পরিশুদ্ধ করতে; যাবতীয় ভুল-ত্রুটি থেকে নিজেদের সত্তাকে পরিচ্ছন্ন করতে এবং আল্লাহর একত্বে তাদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করতে। মুরিদবৃন্দকে তাঁরা শিক্ষা দিয়েছিলেন যাতে সকল কাজে তাঁরা সৎ ও আস্থাভাজন হন, যাতে তাঁরা খোদার ওপর নির্ভর করেন এবং সকল সৎগুণাবলীর অধিকারী হন, যা ইসলাম আমাদের কাছে দাবি করে।

আন্তরিকতা ও পবিত্রতার এ সব মকাম (স্তর) অর্জনের উদ্দেশ্যে সূফী পীরবৃন্দ তাঁদের মুরিদদেরকে বিভিন্ন দোয়া কালাম শিখিয়েছিলেন যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনবৃন্দের আমল ছিল। তাঁরা শিক্ষা দিয়েছিলেন যিকরুল্লাহ্ তথা আল্লাহর স্মরণ, কুরআন পাঠের মাধ্যমে; দোয়া ও তসবীহ, হাদীস শরীফ হতে; আর আল্লাহর নাম ও সিফাত (গুণ)-এর তসবীহ-তাহলীল, তাকবীর ও তামজীদ-এর মাধ্যমে তাঁরাই শিক্ষা দিয়েছিলেন। এগুলো যিকর-সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস্ দ্বারা সমর্থিত।[৮৪]

এ সকল সূফী মুরশিদ (প্রকৃত আলেম-উলামা) খ্যাতি ও উচ্চ পদকে, অর্থবিত্ত ও বস্তুবাদী জীবনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁরা আমাদের যমানার আলেম-উলামার মতো ছিলেন না, যারা যশ-প্রতিপত্তি ও অর্থবিত্তের পেছনে ছুটছেন। বরঞ্চ তাঁরা ছিলেন যাহেদ ও আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল, যেমনিভাবে কুরআনে তিনি আদেশ করেছেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ, "আমি জ্বিন ও ইনসান (মানব) জাতি দুটোকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার এবাদত করার উদ্দেশ্যে"।[৮৫]

সূফীবৃন্দের শিষ্টাচার ও যুহদের ফলে তাঁরা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন সারা মুসলিম জাহানে মসজিদ ও খানেকাহ্ নির্মাণ করতে। বস্তুতঃ এখানে গরীবদের খ্রি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। এরই ফলশ্রুতিতে খানেকাহ্ ও মসজিদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম এক দেশ থেকে আরেক দেশে প্রসার লাভ করে। এ সব আশ্রয়স্থল, যেখানে

[৮৪]. নোট : সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, তাবারানী, ইবনে মাজাহ্, আবু দাউদ ইত্যাদি হাদীসের গ্রন্থে ইসলামে যিকর শীর্ষক অধ্যায়ে এগুলো পাওয়া যায়।

[৮৫]. আল কুর'আন : আয যারিয়াত, ৫১/৫৬।

গরিব মানুষেরা খেতে পেতো ও ঘুমোতে পারতো এবং আশ্রয়হীনরা মাথা গুজবার ঠাঁই পেতো, সেগুলো ছিল গরিবদের অন্তরের জন্যে নিরাময়স্বরূপ; সেগুলো আরও ছিল ধনী ও গরিবের, সাদা ও কালো, হলুদ ও লাল বর্ণের মানুষের, আরব ও অনারবের সম্পর্ক সুদৃঢ় করার এবং একাত্ম হবার স্থান।

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে এরশাদ ফরমান- "আরব ও অনারবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, শুধু ন্যায়-নীতি দ্বারাই পার্থক্য করা হবে"।

এ সকল খানেকাহ্ পৃথিবীর সমস্ত জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের জন্যে সম্মিলনস্থলে পরিণত হয়। সূফীবৃন্দ সুন্নাহ্ এবং শরীয়তকে সমুন্নত রেখেছিলেন। তাঁদের ইতিহাস হলো আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম (জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্) করার সাহসিকতায় ভরা; নিজেদের দেশ ছেড়ে মানুষের মন জয় করার ও ভালোবাসা দিয়ে তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় আনার সংগ্রাম। তাঁরা জাতি-গোষ্ঠী, বয়স ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে ভালোবেসেছিলেন। তাঁরা সবাইকে সম্মান করেছেন, বিশেষ করে অবহেলিত নারী সমাজ ও গরিব-দুঃস্থ মানুষকে। সূফীবৃন্দ ছিলেন পৃথিবীতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো, সর্বত্র দেদীপ্যমান; তাঁরা সবাইকে জেহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ তথা আল্লাহর রাস্তায় কঠিন সাধনা করতে উৎসাহিত করেছিলেন; ইসলাম প্রচার-প্রসারে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন; গরিবদেরকে সাহায্য করতে বলেছিলেন। তাঁরা ঈমানী দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন মধ্য এশিয়া থেকে ভারত, পাকিস্তান, তাশখন্দ, বোখারা, দাগিস্তান এবং চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার মতো অন্যান্য অঞ্চলে।

প্রকৃত সূফীবৃন্দ কখনোই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত ও সুন্নাহ থেকে এবং কুরআন মজীদ থেকে বিচ্যুত হন নি, যদিও কিছু সূফী জযবা হালতে তথা ঐশী ভাবোন্মত্ত অবস্থায় কিছু উক্তি করেছেন এবং আল্লাহর মাহাত্ম্য ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

তাসাউফের প্রধান বা মূল দুটি উৎস কুরআন মজীদ ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ যা সাইয়্যেদুনা হযরত আবু

বকর রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু ও সাইয়্যেদুনা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুর ইসলাম-সম্পর্কিত উপলব্ধির মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। এই দুজন সাহাবীকে সূফী তরিকাহ্সমূহের উৎসমূল বিবেচনা করা হয়। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু তাসাউফের একটি ধারার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- "মা সা'ব-আল্লাহু ফী সাদরী শাইয়ান্ ইল্লা ওয়া সাআবতুহু ফী সাদরি আবি বাকরিন।" অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক যা কিছু আমার অন্তরে ঢেলেছেন তার সবই আমি আবু বকরের রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু অন্তরে ঢেলেছি"।[৮৬] আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে এরশাদ ফরমান–

فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ

–তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁকে (নবী করীম) সাহায্য করেছেন যখন কাফেরদের ষড়যন্ত্রের কারণে তাঁকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতে হয়েছে; একজন ছাড়া তাঁর আর কোনো সঙ্গী ছিল না; তাঁরা দুজনই গুহার মধ্যে ছিলেন।[৮৭]

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি হাদীস শরীফে এরশাদ ফরমান– "আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ছাড়া আবু বকরের (রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু) মতো আর কারো ওপর সূর্য এমনভাবে উদিত হয় নি"।[৮৮] হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুর মকাম (মর্যাদা) ব্যাখ্যাকারী আরও অনেক হাদীস আছে। তাসাউফের অপর ধারাটি সাইয়্যেদুনা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুর মাধ্যমে এসেছে; তাঁর সম্পর্কে বহু হাদীস্ বর্ণিত হয়েছে যা ব্যাখ্যা করতে অনেক পৃষ্ঠা ব্যয় হবে। পরিশেষে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ্ ও শরীয়ত, যা ফরয (অবশ্য

[৮৬]. ইমাম আব্দুল গনী নাবলুসী : হাদিকাতুন নদীয়া, কায়রো থেকে প্রকাশিত, ১৩১৩ হিজরী, পৃষ্ঠা ৯।
[৮৭]. আল কুর'আন : আত তাওবা, ৯/৪০।
[৮৮]. ইমাম সৈয়ুতী : খোলাফায়ে রাশিদীন, কায়রো, ১৯৫২,পৃষ্ঠা ৪৬।

কর্তব্য) ও এহ্সান (আধ্যাত্মিকতা)-এর প্রতিনিধিত্ব করে, তা সূফী বুযুর্গদের চরিত্রে মূর্ত প্রকাশিত ছিল।

হিজরী ১৩শতাব্দীতে একটি নতুন গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে যারা ৭ম হিজরীর দুজন আলেমের শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এরা নিজেদেরকে হাম্বলী মযহাবের অনুসারী দাবি করলেও ওই মযহাবের আকিদা-বিশ্বাস থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা তাসাউফ সম্পর্কে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং চার মযহাব থেকে বিচ্যুত হয়।

সাম্প্রতিককালে ওই নতুন গোষ্ঠীর অনুসারীরা সীমা লঙ্ঘন করে তাদের আধুনিক যুগের গুরুদের ফতোওয়ার ওপর ভিত্তি করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করছে। এই সব গোষ্ঠী-প্রধান নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ফতোওয়া প্রদান করে মুসলমানদের মূলধারা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। বর্তমানে এরাই সূফীতত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করেছে এবং বিগত ১৪০০ বছর যাবত ইসলাম প্রচার-প্রসারে সূফীদের সমস্ত অবদানকে মুছে ফেলতে চাচ্ছে।

আমাদের মুসলমান ভাই ও বোনদের জ্ঞাতার্থে আমরা বিভিন্ন মুসলমান দেশের অগণিত সূফী তাত্ত্বিকদের মধ্য থেকে কয়েকজনের নাম এখানে উপস্থাপন করছি:

(১) মিসরীয় মূফতী হাস্সানাইন মুহাম্মদ আল্ মুখলুফ, মুসলিম ওয়ার্ল্ডে লীগের সদস্য।

(২) মুহাম্মদ আত্ তাইয়ের আন্ নাজ্জার, সুন্নাহ্ এন্ড শরীয়াহ্ ইন্টারন্যাশনালের সভাপতি এবং আল্ আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি।

(৩) শায়খ আব্দুল্রাহ্ কানুন আল্ হাসানী, মরক্কোর উলামা সংস্থা প্রধান এবং ওয়ার্ল্ড ইসলামিক লীগের ডেপুটি।

(৪) ডঃ হুসাইনী হাশিম, মিসর আল্ আযহারের ডেপুটি এবং মক্কার রিসার্চ ইন্সটিটিউটের মহাসচিব।

(৫) সাইয়্যেদ হাশিম আল্ রেফাঈ, কুয়েত সরকারের সাবেক ধর্মমন্ত্রী;

(৬) শায়খ সাইয়্যেদ আহমদ আল্ আওয়াদ, সুদানের মুফতী;

(৭) উস্তায আব্দুল গফুর আল্ আত্তার, সৌদি আরবীয় লেখক সমাজের সভাপতি;

(৮) কাযী ইউসুফ বিন আহমদ আস্ সিদ্দিকী, বাহরাইনী হাইকোর্টের জজ;

(৯) মুহাম্মদ খাযরাজী শায়খ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন যাবারা, ইয়েমেনের মুফতী;

(১০) শায়খ মুহাম্মদ শাযিলী নিভার, তিউসিশিয়ার শরীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট;

(১১) শায়খ খাল আল্ বানানী, মৌরিতানিয়ার ইসলামিক লীগের সভাপতি;

(১২) শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ আহমদ, মিসরের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী;

(১৩) শায়খ মুহাম্মদ বিন আলী হাবাশী, ইন্দোনেশিয়ার ইসলামিক লীগ সভাপতি;

(১৪) শায়খ আহমদ কোফ্তারো, সিরিয়ার মুফতী;

(১৫) শায়খ আবু সালেহ্ মুহাম্মদ আল্ ফাত্তিহ্ আল্ মালেকী, ওনদুরমান, সুদান;

(১৬) শায়খ মুহাম্মদ রাশিদ কাব্বানী, লেবাননের মুফতী;

(১৭) শায়খ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মালেকী আল্ হাসানী, শরীয়ার অধ্যাপক এবং মক্কা ও মদীনার দুটো পবিত্র মসজিদে শিক্ষক; এবং আরো অগণিত সূফীবাদী হক্কানী উলামায়ে কেরাম।

ওহে আমাদের মুসলমান ভাই ও বোনেরা! ইসলাম হলো সহিষ্ণুতা (হিলম্), ভালোবাসা, শান্তি; ইসলাম হলো যুহুদ, এহ্সান; ইসলাম মানে সুসম্পর্ক; ইসলাম মানে পরিবার, ভ্রাতৃত্ব; ইসলাম মানে সাম্য; ইসলাম হলো একটি দেহ; ইসলাম হলো জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা;

ইসলামের যাহেরী (প্রকাশ্য) ও বাতেনী (অপ্রকাশ্য) জ্ঞান বিদ্যমান; ইসলামের অপর নাম সূফীবাদ, আর সূফীবাদ-ই হলো ইসলাম।

পরিশেষে বলবো, ইসলাম ধর্ম হলো আমাদের প্রতি আল্লাহ্তা'আলার প্রেরিত আলো যা তিনি সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন; এই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন ভালোবাসার ও যাহেরী-বাতেনী জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক; সকল মানবের জন্যে তিনি করুণার প্রতীক। তিনি খোদার কাছে আমাদের মধ্যস্থতাকারী; সবার জন্যে তিনি শাফায়াতকারী, যে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ লেখায় ভুলত্রুটি হলে ক্ষমা করুন, আমীন।

[এ লেখাটি As-Sunnah Foundation of America-এর ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এর লেবাননী বংশোদ্ভূত লেখক ওই ফাউন্ডেশনেরই সভাপতি। যোগাযোগঃ www.sunnah.org]

[পাঁচ]

তাসাউফ অর্জন ও বাইয়া'ত গ্রহণ

আলহাজ্ব মুফতী গাজী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সাকীউল ক্বাউছার (মা:)
(ডাবল টাইটেল ফার্স্ট ক্লাস-বিএ)
নায়েব-ই সাজ্জাদানশীন, ঘিলাতলা দরবার শরীফ, কুমিল্লা।

ইসলামে তাসাউফ তথা শরীয়তের পাশাপাশি তরীকত হাকীকত ও মারেফাত অর্জন এবং সে জন্য পীর-মুর্শিদের কাছে বাইয়া'ত গ্রহণ একটি অত্যাবশকীয় বিষয় যা কোরআন, হাদীছ, ইজমা ও ক্বিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত।

এ প্রসঙ্গে প্রথমে আমি মহান কোরআনুল কারীমের আয়াত শরীফ উল্লেখ করছি। আল্লাহ পাক বলেন–

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ
يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

অর্থাৎ, মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ পাকের বড়ই ইহসান যে তাদের মধ্যে হতে তাদের জন্য একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, তিনি আল্লাহ পাকের আয়াতগুলো তেলায়াত করে শুনাবেন, তাদেরকে তাজকিয়া (পরিশুদ্ধ) করবেন এবং কিতাব ও হিকমত (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। যদিও তারা পূর্বে হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল না।[৮৯]

অনুরূপভাবে, সুরা বাকারা'র ১২৯ ও ১৫১ নং আয়াত শরীফে উপরোক্ত আয়াত শরীফের সমার্থবোধক আয়াতে কারীমার উল্লেখ আছে। মূলতঃ উল্লেখিত আয়াত শরীফে বিশেষভাবে চারটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছেঃ তন্মধ্যে আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করে শুনানো এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়া, এ তিনটি বিষয় হচ্ছে এলমে জাহির বা ইলমে ফিকাহ এবং ইলমে মারেফতের অন্তর্ভুক্ত। যা এবাদাতে জাহের বা

[৮৯]. আল কুর'আন : আলে ইমরান, ৩/১৬৪।

দ্বীনের যাবতীয় বাহ্যিক হুকুম-আহকাম পালন করার জন্য ও দৈনন্দিন জীবন যাপনে হালাল কামাই করার জন্য প্রয়োজন। আর চতুর্থ হচ্ছে তাজকিয়ায়ে "ক্বলব", অর্থাৎ, অন্তর পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি লাভ করা। মুফাসসিরীনে কিরামগণ "يُزَكِّيهِمْ" -এর ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ তাফসীরের কিতাব, যেমন তাফসীরে জালালাইন-কামালাইন, বায়হাকী, ইবনে কাছীর, রুহুল বয়ান, তাফসীরে মাযহারী, মা'রেফুল কোরআন-সহ আরও অনেক তাফসীরে তাজকিয়ায়ে ক্বলব বা অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ করাকে ফরজ বলেছেন এবং তজ্জন্যে এলমে তাসাউফ অর্জন করাও ফরজ বলেছেন। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত মুফাসসিরে ফকিহুল উম্মত হযরত মাওলানা শায়খ ছানাউল্লাহ পানিপথি রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে মাযহারী'-তে উল্লেখ করেন, যে সকল লোক ইলমে লা-দুন্নী বা ইলমে তাছাউফ হাছিল করেন তাঁদেরকে সূফি বলে। তিনি ইলমে তাছাউফ অর্জন করা ফরজ আইন বলেছেন। কেননা, ইলমে তাছাউফ মনকে বা অন্তঃকরণকে গায়রুল্লাহ হতে ফিরিয়ে আল্লাহ পাকের দিকে রুজু করে দেয়। সর্বদা আল্লাহ পাকের হুজুরী পয়দা করে দেয় এবং ক্বলব্ বা মন থেকে বদ খাছলত-সমূহ দূর করে নেক খাছলত-সমূহ পয়দা করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দেয়।

আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য ইলমে তাসাউফ যে ফরজ, এ প্রসঙ্গে আফজালুল মুফাসসিরীন আল্লামা হযরত ইসমাঈল হাক্কি রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'তাফসীরে রুহুল বয়ানে' উল্লেখ করেন যে, দ্বিতীয় প্রকার ইলম হচ্ছে ইলমে তাছাউফ যা ক্বলব বা অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য ফরজ।

এলমে তাছাউফ অর্জন করা ফরজ হওয়া সম্পর্কে 'জামিউল উসুল' নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, এলমে তাছাউফ বদ খাছলত-সমূহ হতে নাজাত বা মুক্তি পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম। পক্ষান্তরে, আল্লাহ-প্রাপ্তি, রিপু বিনাশ ও সংযম শিক্ষার একমাত্র পথও। এই জন্য ইলমে তাছাউফ শিক্ষা করা ফরজে আইন।

মূলতঃ শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মারেফত, এ সবের প্রত্যেকটি-ই কোরআন সুন্নাহসম্মত এবং তা মানা ও বিশ্বাস করে কার্যে পরিণত করা কোরআন-সুন্নাহ'র-ই নির্দেশের অর্ন্তভুক্ত।

আল্লাহপাক তাঁর কালাম পাকে এরশাদ করেন–

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

–আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি জীবন বিধান বা শরীয়ত, অপরটি তরীকত-সম্পর্কিত বিশেষ পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি।[৯০]

আল্লাহ পাক তাঁর কালাম পাকে আরও এরশাদ করেন–

وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ

–তারা যদি তরীকতে (সঠিক পথে) কায়েম থাকতো।[৯১] অতএব, তরীকত শব্দটি কোরআন শরীফে রয়েছে।

আর হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে–

اَلشَّرِيعَةُ شَجَرَةٌ وَ الطَّرِيقَةُ اَغصَانُهَا وَ المَعرِفَةُ اَورَقُهَا وَ الحَقِيقَةُ ثَمَرُهَا–

–শরীয়ত একটি বৃক্ষস্বরূপ, তরীকত তার শাখা প্রশাখা, মারেফাত তার পাতা এবং হাকীকত তার ফল ।[৯২]

হাদীস শরীফে আরও এরশাদ হয়েছে–

اَلشَّرِيعَةُ اَقوَالِى وَ الطَّرِقَةُ اَفعَالِى وَالحَقِيقَةُ اَحوَالِى وَالمَعرِيفَةُ اَسرَارِى–

অর্থাৎ, শরীয়ত হলো আমার কথাসমূহ (আদেশ-নিষেধ), তরীকত হলো আমার কাজসমূহ (আমল), হাকীকত হলো আমার গুপ্ত রহস্য। (ফেরদাউস)

উল্লেখ্য যে, উক্ত শিক্ষা বা এলমে তাছাউফ অর্জন করার ও এছলাহে নাফস বা আত্মশুদ্ধি লাভ করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে এমন কোনো কামেলে-মোকাম্মেল পীর-মুর্শিদের কাছে বাইয়া'ত হওয়া, যিনি ফয়েজ দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। এখন প্রশ্ন হলো, এছলাহে নাফস বা আত্মশুদ্ধি লাভ করা যদি ফরজ হয়, আর তা লাভ করার মাধ্যম বাইয়া'ত হয়, তবে বাইয়া'ত হওয়া নাজায়েজ হয় কী করে?

৯০. আল কুর'আন : আল মায়িদা, ৫/৪৮।
৯১. আল কুর'আন : আল জ্বিন, ৭২/১৬।
৯২. সির্‌রুল আসরার।

তরীকত যথাযথভাবে পালন করতে হলে দ্বীনী এলেম অর্জন করতে হবে যা ফরজ। এই এলেম দুপ্রকার–

১) ইলমে ফিকাহ;
২) ইলমে তাছাউফ।

ইলমে ফিকাহ: ইলমে ফিকাহ দ্বারা এবাদাতে জাহেরা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। ইলমে তাছাউফ-এর দ্বারা এবাদাতে বাতেন বা অভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিশুদ্ধ হয়ে ইখলাছ অর্জিত হয়। এ মর্মে হাদীছ শরীফে এরশাদ হয়েছে–

عَنْ الْحَسَنْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ العِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمُ فِىْ القَلْبِ فَذَاكَ العِلْمُ النَّافِعُ وَ عِلْمُ عَلَىْ لِّلِسَانِ فَذَالِكَ حُجَّةُاللهِ عَزَ وَ جَلَّ عَلَى اِبْنِ اَدَمَ.

–এলেম দু'প্রকার (১) ক্বালবী এলেম। এটা হলো উপকারী এলেম। (২) লিসানী বা জবানী এলেম। এটা হলো আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে আদম সন্তানদের প্রতি দলীলস্বরূপ।[৯৩]

আর এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মালিকী মজহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম, ইমামুল আইম্মা রঈসুল মুহাদ্দিসীন ফখরুল ফুকাহা শায়খুল উলামা হযরত ইমাম মালিক রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

مَن تَفَقَّهَ وَ لَم يَتَصَوَّفَ فَقَد تَفَسَّقَ وَ مَن تَصَوَّفَ وَ لَم يَتَفَقَّهَ فَقَد تَزَندَقَ وَ مَن جَمَعَ بَينَهُمَا فَقَد تَحضقَّقَ –

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এলেম ফিকাহ (জবানী এলেম) অর্জন করলো, কিন্তু এলেম তাছাউফ (ক্বালবী) এলেম অর্জন করলো না, সে ব্যক্তি ফাসিক। আর যে ব্যক্তি ইলমে তাছাউফের দাবি করে, কিন্তু শরীয়ত স্বীকার করেনা, সে ব্যক্তি যিন্দীক (কাফের); আর যে ব্যক্তি উভয় প্রকার এলেম অর্জন করলো সে ব্যক্তি মুহাক্কিক তথা মু'মিনে কামেল।[৯৪]

৯৩. মিশকাতুল মাসাবীহ : ১/৮৯ হাদীস নং ২৭০।
৯৪. মিরকাত, কিতাবুল ইলম।

অর্থাৎ, এলমে ফিকাহ ও এলমে তাছাউফ উভয় প্রকার এলেম অর্জন করে দ্বীনের ওপর সঠিকভাবে চলার চেষ্টা করা প্রত্যেকের জন্য ফরজ। বর্তমান মুসলমানের কাছে আসল সত্য জিনিস বা শিক্ষা না থাকাতে মানুষ প্রকৃত মু'মিন হতে পারছে না। কেবল মাত্র ক্বলব নামের অমূল্য রত্নটা হস্তগত করতে জীবনের সব সময়ই চলে যায়, তবে মানুষ খাঁটি ঈমানদার হবে কবে। এ জন্য আমরা চিন্তা-ফিকির করি না। তরীকতের এমন সরল সহজ পথ অবলম্বন করা দরকার যাতে মানুষ খুবই অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত নেয়ামত পেতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত নেয়ামত বা এলমে তাছাউফ অর্জন করার ও এছলাহে নফস বা আত্মশুদ্ধি লাভ করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে কোনো কামেলে-মোকাম্মেল পীর-মুর্শিদের কাছে বাইয়া'ত হওয়া। এখন প্রশ্ন হলো, তাজকিয়ায়ে নাফস বা আত্মশুদ্ধি লাভ করা যদি ফরজ হয়, আর তা লাভ করার মাধ্যম বাইয়াা'ত হয়, তবে বাইয়া'ত হওয়া নাজায়েজ হয় কী করে? কেননা উছুল-ই রয়েছে যে আমলের দ্বারা ফরজ পূর্ণ হয় এবং সেই ফরজকে পূর্ণ করার জন্য সে আমল করাও ফরজ। উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেনঃ যেমন এ প্রসঙ্গে "দুররুল মুখতার" কিতাবে উল্লেখ আছে, যে আমল ব্যতিরেকে ফরজ পূর্ণ হয় না বা আদায় হয় না, সে ফরজ আদায় করার জন্য সে আমলটাও ফরজ। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নামাজ আদায় করা ফরজ। আর এ নামাজ আদায় হওয়ার একটি শর্ত হচ্ছে পবিত্রতা অর্জন করা, অর্থাৎ, ওজু। যখন কেউ নামাজ আদায় করবে, তখনই তার জন্য ওযু করা ফরজ হয়ে যাবে। যেহেতু ওজু ছাড়া নামাজ হবে না, ঠিক তদ্রুপ-ই এলমে তাছাউফ অর্জন করা ফরজ। আর বাইয়া'ত হওয়াও ফরজ। আর হাদীস শরীফের ভাষায় এ ধরনের ফরজকে অতিরিক্ত ফরজ বলে গণ্য করা হয়েছে। কাজেই উক্ত হাদিসে বর্ণিত অতিরিক্ত ফরজের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মাজহাব মানা, বাইয়া'ত হওয়া ইত্যাদি।

বস্তুতঃ পীর-মুর্শিদের কাছে বাইয়া'ত হতে হবে। এটা মহান আল্লাহ পাকের কালামে অসংখ্য আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত। যদি এখন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহাজ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্য না মানেন, তবে কার কী বলার আছে। তাদেরকে যতোই

বোঝানো হউক না কেন, কিছুতেই তারা বোঝার চেষ্টা করবে না; বা বুঝতে সক্ষম হবেও না। তাদের ক্বালবে সীলমোহর মারা আছে।

সূফীকুল শিরোমনি আল্‌রামা জালাল উদ্দিন রুমী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

'ইলমে জাহের হাম চুঁ মসকা, ইলমে বাতেন হাম চুঁ শীর
কায় বুয়াদে বে শীরে মসকা, কায় বুয়াদে বেপীরে পীর'।

অর্থাৎ, ইলমে জাহের জানো দুধের মেছাল (উপমা), আর বাতেন জানো মাখনের মেছাল, দুধ ছাড়া মাখন কীভাবে হয় আর পীরের আনুগত্য ছাড়া পীর কীভাবে হয়।[৯৫]

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে এরশাদ করেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় করো, আর ছাদেকীনদের সঙ্গী হও।[৯৬]

এ আয়াত পাকে আল্লাহ পাক মূলতঃ পীর-মাশায়েখগণের সঙ্গী বা সোহবত এখতিয়ার করার কথা বলেছেন। কারণ হক্কানী মুর্শিদগণ-ই হাকীকি ছাদেকীন।

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা কোরআন শরীফের প্রথম সূরাতেই শিখিয়ে দিচ্ছেন–

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ

অর্থাৎ, আমাদের সরল সঠিক পথ [সীরাতে মুস্তাকিম] দেখাও। তাঁদের পথ যাঁদেরকে তুমি নিয়া'মত দান করেছো।[৯৭]

সূরায় ফাতিহায় মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দারা যে পথে চলেছেন, সেটাকে সাব্যস্ত করেছেন সীরাতে মুস্তাকিম।

আর তাঁর নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দারা হলেন–

---

৯৫. মসনবী শরীফ।
৯৬. আল কুর'আন : আত তাওবা, ৯/১১৯।
৯৭. আল কুর'আন : আল ফাতিহা, ১/৬-৭।

ٱلَّذِينَ أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ

অর্থাৎ, যাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত দিয়েছেন, তাঁরা হলেন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও নেককার বান্দাগণ।[৯৮]

এ দুআয়াত একথাই প্রমাণ করছে যে, নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা হলেন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ, আর নেককারগণ তথা আল্লাহ'র অলীগণ, যাঁদের শানে আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা দেন–

أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ

অর্থাৎ, সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহ'র অলী বা বন্ধুগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁদের কোনো চিন্তা-পেরেশানী নেই।[৯৯]

আর ওই সকল প্রিয় বান্দাদের পথ-ই সরল সঠিক তথা সীরাতে মুস্তাকিম। অর্থাৎ, তাঁদের অনুসরণ করলেই সীরাতে মুস্তাকিমের ওপর চলা হয়ে যাবে। যেহেতু আমরা নবী দেখিনি, দেখিনি সিদ্দীকগণও, দেখিনি শহীদদের। তাই আমাদের সাধারণ মানুষদের কুরআন সুন্নাহ থেকে বের করে সীরাতে মুস্তাকিমের ওপর চলার চেয়ে একজন পূর্ণ শরীয়ত-তরীকতপন্থী হক্কানী বুযুর্গের অনুসরণ করার দ্বারা সীরাতে মুস্তাকিমের ওপর চলাটা হবে সবচেয়ে সহজ। আর একজন শরীয়ত সম্পর্কে প্রাজ্ঞ আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তির সাহচর্য গ্রহণ করার নাম-ই হল পীর-মুরিদী বা তাসাউফ অর্জন ও বাইয়া'ত গ্রহণ।

আল্লাহ পাক তাঁর পাক কালামে আরো এরশাদ করেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُواْ فِي سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣٥

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহপাককে ভয় করো, আর তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উছিলা গ্রহণ করো।[১০০]

৯৮. আল কুর'আন : আন নিসা, ৪/৬৯।
৯৯. আল কুর'আন : ইউনুস, ১০/৬২।

মুফাসসিরীনগণ বলেন, উল্লেখিত আয়াত শরীফে বর্ণিত উছিলা দ্বারা তরীকতের মাশায়েখগণকে বোঝানো হয়েছে। যেমন তাফসীরে রুহুল বয়ানে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে– اَلْوَسْلُ لاَ يَحْصِلُ اِلاَّ بِالْوَسِيْلَةِ وَهِيَ عُلَمَاءِ مُحَقِّقِيْنَ وَمَشَائِخُ الْطَّرِيْقَةِ অর্থাৎ ,উক্ত আয়াতে উছিলা ছাড়া উদ্দেশ্যকে (আল্লাহ্কে) লাভ করা যাবেনা, আর সে উছিলা হলো মুহাক্কীক আলেম বা যিনি তরীকতের শায়খ বা পীর। যদিও অনেকে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, দান সদকা, জিহাদ ইত্যাদিকে উছিলা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাকিকতে পীর-মাশায়েখগণই হচ্ছেন প্রধান ও শ্রেষ্ঠতম উছিলা। কারণ পীর-মাশায়েখগণের কাছে বাইয়া'ত হওয়া ছাড়া তাজকিয়া নাফস বা আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয় না। আর আত্মশুদ্ধি ব্যতিরেকে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ, তাবলীগ কোনো কিছুই আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয় না বা নাজাতের উছিলা হয় না। তাই দেখা যাবে অনেক লোক নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, দান ছদকা, জিহাদ, তাবলীগ ইত্যাদি করেও এক লাফে জাহান্নামে যাবে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ; অর্থাৎ, মুসল্লীদের জন্য জাহান্নাম।[১০১] কোন মুসল্লী জাহান্নামে যাবে - যে মুসল্লী তাজকিয়ায়ে নাফসের মাধ্যমে অন্তর থেকে রিয়া দূর করে "ইখলাছ" হাছেল করেনি, তাই সে মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজ আদায় করছে। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নামাজ আদায় করেনি। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ অর্থাৎ, তারা ওই নামাজি যারা রিয়ার সহকারে নামাজ আদায় করেছে।[১০২]

একটি হাদীছ শরীফ উল্লেখ করলাম যাতে আপনারা বুঝতে পারেন। মুসলিম শরীফের ছহীহ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে কেয়ামতের দিন শহীদ, দানশীল ও দ্বীন প্রচারকারী আলেম, এ তিন প্রকার লোক থেকে কিছু লোককে সর্বপ্রথম জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, যেহেতু তারা এখলাছের সাথে জিহাদ, তাবলীগ, দান ছদকা ইত্যাদি করেনি। যে সব আলেম বলে থাকে কোরআন শরীফে বর্ণিত উছিলা হচ্ছে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, জিহাদ ইত্যাদি, তাদের কাছে আমার

১০০. আল কুর'আন : আল মায়িদা, ৫/৩৫।
১০১. আল কুর'আন : আল মাউন, ১০৭/৪।
১০২. প্রাগুক্ত : ১০৭/৬।

প্রশ্নঃ তাহলে নামাজ আদায় করে জিহাদ করে ইলিয়াছি তাবলীগ করেও বান্দা জাহান্নামে যাবে কেন? কেনো উক্ত আমলসমূহ তার জন্য নাজাতের উছিলা হলো না? নিশ্চয়ই আপনারা বলবেন, তাদের এখলাছ ছিল না। কেন এখলাছ ছিল না? তারা কামেলে-মোকাম্মেল পীরের কাছে বাইয়া'ত হয়ে এলমে তাছাউফ আমলের মাধ্যমে তাজকিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধি লাভ করে এখলাছ অর্জন করেনি। তাহলে বোঝা গেল, পীর-মাশায়খগণ হচ্ছেন প্রধান ও শ্রেষ্ঠতম উছিলা, তথা উছিলাসমূহের উছিলা। কারণ তাঁদের কাছে বাইয়া'ত হওয়ার উছিলাতেই এছলাহ লাভ হয়, এখলাছ অর্জিত হয়। যার ফলে নামাজ, রোজা, জিহাদ, দান খয়রাত ইত্যাদি কবুল হয় বা নাজাতের উছিলা হয়।

কামেল পীর-মুর্শিদের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি হেদায়েত চায় আল্লাহ পাক তাকে হেদায়েত দেন, আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর মধ্যে দৃঢ় থাকে, সে কখনও অলিয়ে কামেল মুর্শিদ খুঁজে পাবে না।[১০৩]

উক্ত আয়াত শরীফের দ্বারা মূলতঃ এটাই বোঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো কামেল-মোকাম্মেল পীর সাহেবের কাছে বাইয়া'ত হয়নি, সে ব্যক্তি গোমরাহ।

আল্লাহ্ পাক আরও মুর্শিদের আনুগত্যের বিষয়ে এরশাদ করেন–

أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

অর্থাৎ, আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং যারা তোমাদের মধ্যে হুকুমদাতা।[১০৪]

[১০৩]. আল কুর'আন : আল কাহাফ, ১৮/১৭।
[১০৪]. আল কুর'আন : আন নিসা, ৪/৫৯।

উক্ত আয়াতে কারীমায় 'তোমাদের মধ্যে যারা হুকুমদাতা (উলিল আমর)' দ্বারা শরীয়ত ও তরীকতের আলেমকে বোঝানো হয়েছে। এটাই বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত।

আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন–

يَوْمَ نَدْعُوا۟ كُلَّ أُنَاسٍۭ بِإِمَٰمِهِمْ ۖ

অর্থাৎ, সেই দিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের ইমামের (শায়খের) নামে আহ্বান করবো।[১০৫]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে "আ'রায়েসুল বয়ান"-এ উল্লেখ রয়েছে, وَيَدْعُوْ الْمُرِيْدِيْنَ بِاَسْمَاءِ مَشَائِخِهِمْ অর্থাৎ, হাশরের দিন প্রত্যেক মুরীদকে ডাকা হবে যার যার শায়খ বা পীরের নামে। তাই পীরের দলভুক্ত হয়ে আল্লাহ'র দরবারে হাজিরা দিতে হবে।

বাই'য়াত

"বাইয়া'ত" শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, "বাইয়ু'ন" শব্দ থেকে।"বাইয়ু'ন" শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে "ক্রয়-বিক্রয়"। এখানে এই "ক্রয়-বিক্রয়" মানে হচ্ছে আমার আমিত্বকে আল্লাহর রাহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা নায়েবে রাসূলের কাছে কোরবান করে দিলাম, বিলীন করে দিলাম, বিক্রি করে দিলাম। আমার আমিত্ব, আমার যতো অহঙ্কার আছে, অহমিকা আছে, আমি আমি যতো ভাব আছে, সমস্ত কিছু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা নায়েবে রাসূলের কাছে আল্লাহর রাহে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে দেয়া, কোরবান করে দেয়া, বিক্রি করে দেয়া, এবং পক্ষান্তরে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে কোরআন সুন্নাহ-ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা খরিদ করে, সমস্ত উপাসনার মালিক আল্লাহ, এবাদতের মালিক আল্লাহ, কুল মখলুকাতের মালিক আল্লাহ, এই দৃঢ় ঈমানে ঈমানদার হয়ে যাওয়া, এটাকেই বলা হয় বাইয়াত বা "ক্রয়-বিক্রয়"।

[১০৫]. আল কুর'আন : আল ইসরা, ১৭/৭১।

আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত এরশাদ করেন–

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ খরিদ করে নিয়েছেন মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল এর বিনিময়ে যে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, কখনও হত্যা করে এবং কখনও নিহত হয়। তাওরাত ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আল্লাহর চাইতে নিজের ওয়াদা অধিক পালনকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আনন্দ করো তোমাদের সে সওদার জন্য যা তোমরা তাঁর সাথে করেছো। আর তা হলো মহা সাফল্য।[১০৬]

لَّقَدْ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ

অর্থাৎ, হে রাসূল! আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাইয়া'ত হচ্ছিল।[১০৭]

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ করবে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে, সে আল্লাহ পাকের প্রিয়জন

১০৬. আল কুর'আন : আত তাওবা, ৯/১১১।
১০৭. আল কুর'আন : আল ফাত্হ, ৪৮/১৮।

হবে। আর নিশ্চিতভাবে আল্লাহ পাক মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।[১০৮]

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ

অর্থাৎ, হে রাসূল! যেসব লোক আপনার কাছে বাইয়া'ত হচ্ছিল, তারা আসলে আল্লাহর কাছেই বাইয়া'ত হচ্ছিল। তাদের হাতের ওপর আল্লাহর (কুদরতের) হাত ছিল।[১০৯]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ

অর্থাৎ, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যে সকল মু'মিন মহিলা আপনার কাছে বাইয়াত হওয়ার জন্য আসে (মুরিদ হওয়ার জন্য আসে), তাঁদেরকে আপনি বাইয়া'ত দান করুন।[১১০]

হাদিছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আওফ বিন মালেক আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً، فَقَالَ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ قَالَ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ قَالَ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ قَالَ عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا.

–আমরা ৯জন কিংবা ৮ অথবা ৭ জন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। হযরত নবী

১০৮. আল কুর'আন : আলে ইমরান, ৩/৭৬।
১০৯. আল কুর'আন : আল ফাত্হ, ৪৮/১০।
১১০. আল কুর'আন : আল মুমতাহানা, ৬০/১২।

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের হাতে বাইয়া'ত হবে না? আমরা নিজ নিজ হাত প্রসারিত করে দিলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ'র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিষয়ের বাইয়া'ত হবো? নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বিষয়ের ওপর যে তোমরা আল্লাহ পাকের এবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কায়েম করবে এবং যাবতীয় হুকুম-আহকাম শুনবে ও মান্য করবে।[১১১]

অন্য হাদীছ শরীফে এরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করলো যে, তার গর্দানে বাইয়া'তের (আনুগত্যের) বেড়ি থাকলো না, সে জাহেলীয়াতের মৃত্যুতে মৃত্যু বরণ করলো।[১১২]

পীর মাশায়েখগণের মধ্যে বাইয়া'ত করার যে প্রথা প্রচলিত তার সারমর্ম হলো জাহেরী ও বাতেনী আমলের ওপর দৃঢ়তা অবলম্বন করা এবং গুরুত্ব প্রদান করার অঙ্গীকার করা। তাঁদের পরিভাষায় একে বাইয়া'তে তরীকত, অর্থাৎ, তরীকতের কাজ বা আমল করার অঙ্গীকার করা। কেউ কেউ এ বাইয়া'তকে অস্বীকার করে থাকেন। কারণ হিসেবে বলেন যে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তা বর্ণিত নেই। তখন শুধু কাফেরদেরকে ইসলামের বাইয়া'ত করার দরকার ছিল। কিন্তু উল্লেখিত হাদীছ শরীফে এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। তাই অনেক ইমাম মুজতাহিদ আলেমগণ বলেছেন- مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْخٌ

১১১. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু কারাহাতিল মাসায়ালাতিল লিল্লাস, ২/৭২১ হাদীস নং ১০৪৩।
(ক) ইব্ন মাজাহ : আস সুনান, বাবুল বায়'আত, ২/৯৫৭ হাদীস নং ২৮৬৭।
(খ) আবু দাউদ : আস সুনান, বাবুল কারাহিয়্যাতিল মাসয়ালা, ২/১২১ হাদীস নং ১৬৪২।
(গ) বায্যার : আল মুস্নাদ, মিন হাদীসি আওফ বিন মালেক, ৭/১৯৩।
(ঘ) নাসায়ী : আস সুনান, ১/২২৯ হাদীস নং ৪৬০।
(ঙ) ত্বরানী : আল মু'জামুল কাবীর, ১৮/৩৯।
(চ) বায়হাক্বী : শুয়াবুল ঈমান, ৫/১৬৪ হাদীস নং ৩২৪৩।
১১২. মুসলিম : আস সহীহ, বাবুল আমরি বিলুযূমিল জামা'আত, ৩/১৪৭৮ হাদীস নং ১৮৫১।
(ক) বায়হাক্বী : শু'য়াবুল ঈমান, বাবু তারগিবি ফি লুযূমিল জামা'আত, ৮/২৭০ হাদীস নং ১৬৬১২।
(খ) বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, ১০/৮১।

فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ (জুনায়েদ বাগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি)। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোনো হাক্কানী পীর বা শায়েখের বাইয়া'ত গ্রহণ করেনি, তার শায়খ বা ওস্তাদ হয় শয়তান। শয়তান-ই তাকে গোমরাহ বা বিভ্রান্ত করে দেয়। কাজেই গোমরাহী থেকে বাঁচা যেহেতু ফরজ, সেহেতু পীর-মুর্শিদের কাছে বাইয়া'ত হওয়া ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাই পীর-মুর্শিদের কাছে বাইয়া'ত হওয়াও ফরজ। আর ঠিক এ কথাটি বলেছেন আমাদের হানাফী মজহাবের ইমাম, ইমাম আযম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বলেন, "লাওলা ছানাতানি লাহালাকান নোমান"। অর্থাৎ, "আমি নোমান বিন ছাবিত যদি দুটি বছর না পেতাম তবে হালাক হয়ে যেতাম"। অর্থাৎ, যদি আমি আমার পীর সাহেব ইমাম জাফর সাদেক রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুর কাছে বাইয়া'ত হয়ে দুটি বছর অতিবাহিত না করতাম, তবে আত্মশুদ্ধি লাভ না করার কারণে গোমরাহ ও হালাক (ধ্বংস) হয়ে যেতাম।

আর বিখ্যাত কবি, দার্শনিক ও আলেমকুল শিরোমণি বিশিষ্ট সুফি সাধক হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

[মাওলানা রুম হারগেজ কামেল নাশুদ; তা গোলামে শামছে তিবরীজ নাশুদ।]

অর্থাৎ, আমি মাওলানা রুমী ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ-ওয়ালা হতে পারিনি যতোক্ষণ পর্যন্ত আমার পীর হযরত শামছে তাবরীজ রহমতুল্লাহি আলাইহির কাছে বাইয়া'ত হয়ে এলমে তাছাউফ আমল করে এখলাছ হাছিল না করেছি। অর্থাৎ, এলমে তাছাউফ আমলের মাধ্যমে এখলাছ অর্জন করার পরই আমি হাকীকি মু'মিন হতে পেরেছিলাম (মসনবী)।

তাই কাদেরীয়া তরীকার ইমাম হযরত গাউছুল আযম মাহবুবে ছোবহানী কুতুবে রব্বানী গাউছে সামদানী শায়খ মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জীলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিখ্যাত কেতাব "সিররুল আসরার"-এর ৫ম অধ্যায়ে তওবার বয়ানে লিখেছেন, ক্বলব বা অন্তরকে জীবিত বা যাবতীয় কু-রিপু হতে পবিত্র করার জন্য আহলে তালকীন তথা পীরে কামেল গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর

জন্য ফরজ। কারণ তাওহীদের রত্ন (বীজ) কোনো যোগ্য মুর্শিদের অন্তর থেকে গ্রহণ করতে হবে।

হাদীস শরীফে যে এলেম অর্জন করা ফরজ বলা হয়েছে তা দ্বারা এলমে মারেফাত ও কোরবতকেই বোঝানো হয়েছে। এ ছাড়া আরও অন্যান্য সর্বজনমান্য ও সর্বজনস্বীকৃত ইমাম-মুজতাহিদ ও আওলিয়া ই-কিরামগণ রহমতুল্লাহি আলাইহি পীর-মাশায়েখের কাছে বাইয়া'ত গ্রহণ করা ফরজ বলে ফতওয়া দিয়েছেন।

উদাহরণস্বরূপ, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গাযালী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর "এহইয়াউ উলুমুদ্দীন ও কিমিয়ায়ে সায়াদাত" কিতাবে, হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি আজমেরী রহমতুল্লাহি আলাইহির মালফুজাত "আনিসুল আরওয়াহ" কিতাবে, ইমামুশ শরীয়াত ওয়াত তরীকত শায়খ আবুল কাশেম কুশাইরী রহমতুল্লাহি আলাইহি "রিছালায়ে কুশাইরিয়া" কিতাবে, হযরত মাওলানা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি রহমতুল্লাহি আলাইহি "মালাবুদ্দা মিনহু ও এরশাদুত্তালেবীন" কিতাবে, শাহ আব্দুল আজিজ মহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি "তাফসীরে আজিজ" শীর্ষক কিতাবে, আল্লামা শামী রহমতুল্লাহি আলাইহি "রদ্দুল মোখতার" কিতাবে, ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর "তাফসীরে কবীর" কিতাবে, কাইয়্যুমে আউয়াল আফজালুল আউলিয়া হযরত ইমাম মোজাদ্দেদে আলফে ছানী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিখ্যাত আল-"মাকতুবাত শরীফে", হযরত ইমাম আহমদ রেফায়ী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর "বুনইয়ানুল মুআইয়্যাদ" কিতাবে, হযরত ইসমাঈল হাক্কি রহমতুল্লাহি আলাইহি "তাফসীরে রুহুল বয়ানে" সরাসরি পীর গ্রহণ করা ফরজ বলে ফতুয়া দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে কারামত আলী জৌনপুরীও তার "যাদুত তাকাওয়াতে" লিখেছে যে এলমে তাছাউফ ছাড়া ইলমে শরীয়তের ওপর যথাযথ আমল করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং ছাবেত হলো যে এলমে মারেফত চর্চা করা সকলের জন্যই ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। আর এই এলেমে তাছাউফ পারদর্শী মুর্শিদে কামেল-এর সোহবত ও তা'লীম ব্যতিরেকে অর্জন করা কখনও সম্ভব নয়।

হাটহাজারী খারিজিদের মুরুব্বী মুফতী শফি সাহেব স্বয়ং নিজেই "মা'আরেফুল কুরআনে" সূরা বাক্বারায় উক্ত আয়াত শরীফের তাফসীরে লেখেন, আত্মশুদ্ধি অর্জিত হবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত এছলাহ-প্রাপ্ত কোনো বুযুর্গ বা পীরে কামেলের অধীনে থেকে তালীম ও তরবিয়াত হাসিল না করবে। আমল করার হিম্মত তাওফিক কোনো কিতাব পড়া ও বোঝার দ্বারা অর্জিত হয় না, তা অর্জন করার একটি-ই পথ; আর তা হলো অলীগণের সোহবত তথা সান্নিধ্য।

পীর-মুর্শিদগণই হচ্ছেন হাকীকি আলেম। কেননা, পীর-মুর্শিদগণই এলমে শরীয়ত ও মারেফত, এই উভয় প্রকার এলমের অধিকারী। আর উক্ত উভয় প্রকারের এলমের অধিকারীগণই হচ্ছেন হাদীছ শরীফের ঘোষণা অনুযায়ী– اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ প্রকৃত আলেম বা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া। যেমন এ প্রসঙ্গে ইমামে রব্বানী মাহবুবে সুবহানী কাইয়্যুমে আওয়াল সুলতানুল মাশায়েখ হযরত মোজাদ্দেদ আলফে ছানি রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'মকতুবাত শরীফে' উল্লেখ করেন, আলিমগণ নবীগণের ওয়ারিছ। এ হাদীস শরীফে বর্ণিত আলেম তারাই যাঁরা নবীগণের রেখে যাওয়া এলমে শরীয়ত ও এলমে মারিফত এই উভয় প্রকার এলমের অধিকারী। অর্থাৎ, তিনি-ই প্রকৃত ওয়ারিছ বা স্বত্বাধিকারী। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র এক প্রকারের এলমের অধিকারী, সে নবীগণের প্রকৃত ওয়ারিশ নয়। কেননা, পরিত্যক্ত সম্পত্তির সকল ক্ষেত্রে অংশিদারী হওয়াকেই ওয়ারিছ বলে। আর যে ব্যক্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোনো নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী হয়, তাকে 'গরীম' বলে। অর্থাৎ, সে ওয়ারিছ নয়, গরীমের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, যারা পীর-মাশায়েখ নয়, অর্থাৎ, শুধু এলমে শরীয়তের অধিকারী ও এলমে তাছাউফ-শূন্য, তারা প্রকৃত আলেম নয়।

অতএব, প্রমাণিত হলো, হক্কানী পীর-মাশায়েখগণই হচ্ছেন প্রকৃত বা খাঁটি আলেমে দ্বীন। ক্বলব জারি করতে হলে তাঁদের কাছে যেতে হবে। যে ব্যক্তি কোনো পীর-মাশায়েখের কাছে বাইয়া'ত হয়ে আত্মশুদ্ধি লাভ করে খিলাফত প্রাপ্ত হয়নি, তার কাছে বাইয়া'ত হওয়া অনুচিত।

অতএব, আত্মশুদ্ধি ও এলমে তাছাউফ অর্জন করা যেহেতু ফরজে আইন, আর কামেল পীর-মাশায়েখ ছাড়া এলমে তাছাউফ বা আত্মশুদ্ধি

অর্জন করা সম্ভব নয়, সেহেতু একজন কামেল পীর-মুর্শিদ অন্বেষণ করে বাইয়া'ত গ্রহণ করা ফরজ। এটাই গ্রহণযোগ্য, বিশুদ্ধ ও দলীলভিত্তিক ফতওয়া। এর বিপরীত মত পোষণকারীরা বাতিল ও গোমরাহ।

ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।
আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আ'লামু

[ছয়]

তাযকিয়ায়ে নফস্ (প্রবৃত্তি/ষড়রিপুর পরিশুদ্ধি): সূফী প্রেরণার একটি মৌলনীতি

শায়খ হিশাম কাব্বানী (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

প্রাথমিক যুগের সূফী প্রচারকবৃন্দ ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার করেছিলেন সমগ্র ভারত উপমহাদেশে, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, আফ্রিকায় এবং এমন কি রাশিয়ার কিছু অংশেও - ঠিক যেমনি বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকায় সমসাময়িককালের সূফীমন্ডলী ইসলামী আকিদার বিস্তার ঘটাচ্ছেন। কিন্তু সূফীদের উৎপত্তিস্থল কোথায়? আর তাসাউফ বা সূফীতত্ত্বের ব্যাপারে ইসলামী ফেকাহের বিভিন্ন মযহাবের এবং সমাজের বরেণ্য জ্ঞান বিশারদদেরই বা দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? [এখানে তাসাউফ মানে হলো আত্মশুদ্ধিবিষয়ক ইসলামী জ্ঞানের শাস্ত্র এবং আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্ণতাপ্রাপ্ত চরিত্রের অনুকরণ-অনুসরণ]

আজকাল ইসলাম ধর্ম এমন কিছু লোকের কথা দ্বারা প্রচার হচ্ছে যারা এর অনুশীলনের ধারই ধারে না, অথবা যারা এর চর্চার মাধ্যমে নিজেদের পরিশুদ্ধও করে না। এই দুর্ভাগ্যজনক অধঃপতন সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল; উদাহরণস্বরূপ, এরশাদ হয়েছে, "তারা (তথাকথিত প্রচারকরবর্গ) মানুষকে উপদেশ দেবে, কিন্তু নিজেরা সেই অনুযায়ী অনুশীলন (আমল) করবে না" (সর্ব-হযরত উমর, আলী, ইবনে আব্বাস ও অন্যান্যদের দ্বারা বর্ণিত। এগুলো হযরত আবু তালেব মক্কী প্রণীত 'কুত আল-কুলূব ফী মু'আমালাত আল-মাব্বুব' গ্রন্থের 'দুনিয়ার আলেম ও আখেরাতের আলেমবৃন্দের মধ্যে পার্থক্য' শীর্ষক অধ্যায়ে সংগৃহীত। কায়রো হতে 'মাতবা'আত আল-মায়মুনিয়্যা' কর্তৃক ১৩১০ হিজরী/১৮৯৩ খৃঃ সালে প্রকাশিত বইটির ১ম খণ্ডের ১৪০-১৪১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

একইভাবে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমি শুধু তোমাদের প্রতি (ঈসা) মসীহ-বিরোধীদের (ইহুদীদের) বৈরিতা আশঙ্কা করি না"। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, "এ ছাড়া আর কাদের তরফ থেকে আশঙ্কা করেন"? তিনি বলেন, "গোমরাহ/পথভ্রষ্ট আলেমদের থেকে"

(ইমাম আহমদ কৃত মুসনাদ)। তিনি অন্যত্র আরও এরশাদ করেন, "আমার উম্মতের জন্যে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পাই যাকে, সে হলো আলেমের মতো জিহ্বাসম্বলিত মোনাফেক/কপট ব্যক্তি" (ইমাম আহমদ সহীহ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন তাঁর মুসনাদ পুস্তকে)। এটা তো ছিল না সাহাবীদের, বিশেষ করে আহলুস্ সুফ্ফাদের পথ– যে সূফীদের সম্পর্কে আয়াত নাযেল হয়েছে,

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

–এবং (হে রসূল), আপন আত্মাকে তাদেরই সাথে সম্পর্কযুক্ত রাখুন যারা সকাল-সন্ধ্যায় নিজেদের প্রতিপালককে আহ্বান করে, তাঁরই সন্তুষ্টি চায় এবং আপনার চোখ দুটো যেন তাদেরকে ছেড়ে অন্য দিকে না ফেরে; আপনি কি পার্থিব জীবনের শোভা/সৌন্দর্য কামনা করবেন? আর সেই ব্যক্তির কথা মানবেন না যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং সে আপন খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেছে, আর তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে।[১১৩]

আর ওই কপটতার পথ ছিল না হযরত আবু বকরের (রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা) আনহু-ও যাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু) তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বেশি বেশি নামায-রোযা করার জন্যে নয়, বরং তাঁর অন্তরে রহস্য (আধ্যাত্মিকতা) শিকড় গাড়ার জন্যেই এই শ্রেষ্ঠত্ব" (ইমাম আহমদ এটি বর্ণনা করেছেন তাঁর কিতাব 'ফযাইলে সাহাবাতে' যা ওয়াসিউল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ আব্বাস সম্পাদিত এবং মক্কা হতে প্রকাশিত মুআস্সাসাত আল রিসালা ১৯৮৩, ১:৪১ #১১৮ গ্রন্থে বিদ্যমান)। আর তাঁদের উত্তরসূরী হাসান বসরী, সুফিয়ান সাওরীর মতো তাবেঈনবৃন্দ এবং পরবর্তী যুগের অন্যান্য সূফীমন্ডলী যাঁরা ওই

[১১৩]. আল কুর'আন : আল কাহাফ, ১৮/২৮।

পূর্বসূরীদেরকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাও সেই কপটতার অনুসরণ করেন নি। সূফীকুল শিরোমণি হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর কথা ইমাম কুশাইরী বর্ণনা করেন, যিনি বলেন, "তাসাউফ নামায ও রোযার অতি প্রাচুর্য নয়, বরং অন্তরের (কল্বের) পূর্ণতা ও নিজেকে বিলীন করা"।[১১৪]

এ ধরনের কপটতার পথ গ্রহণ করেন নি চার মযহাবের ইমামবৃন্দও, যাঁরা স্রেফ ফরয আদায়ের তৃপ্তির চেয়ে যুহদ (কৃচ্ছ্রব্রত) ও প্রকৃত তাকওয়া (খোদাভীতি)-এর ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করতেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহি আলাইহি এই দুটো বিষয়ের ওপর সংশ্লিষ্ট শিরোনামযুক্ত আলাদা দুটো বই লিখেছেন। তিনি সূফী-দরবেশদের জ্ঞানকে (যাহেরী) আলেমদের জ্ঞানের চেয়ে উচ্চমর্যাদা দিয়েছেন, যা তাঁরই শিষ্য আবু বকর আল মারওয়াযীর রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা থেকে পরিস্ফুট হয়; তিনি বর্ণনা করেন, ফাতাহ্ ইবনে আবি আল্ ফাতাহ্ রহমতুল্লাহি আলাইহি ইমাম আহমদ হাম্বলের রহমতুল্লাহি আলাইহি শেষ অসুখের সময় তাঁকে বলেন, "আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যাতে তিনি আমাদেরকে আপনার একজন যোগ্য উত্তরাধিকারী মঞ্জুর করেন।" অতঃপর জিজ্ঞেস করেন, "আপনার পরে আমরা কার কাছে জ্ঞান শিক্ষা করবো?" ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহি আলাইহি উত্তর দেন, "আবদুল ওয়াহ্হাবকে জিজ্ঞেস করো"। ওখানে উপস্থিত কেউ একজন বলে উঠলেন, "কিন্তু তিনি তো বেশি জ্ঞানী নন"। আবু আবদিল্লাহ (ইমাম আহমদ) উত্তর দিলেন, "তিনি একজন দরবেশ, আর তাই সত্য বলার ক্ষেত্রে তাঁকে সাফল্য নসীব করা হয়েছে"।[১১৫]

সুপ্রসিদ্ধ একটি ফতোওয়ায় শাফেয়ী মযহাবের ইমাম আল্ ইযয্ ইবনে আবদ্ আল সালামও আরেফীনদেরকে (খোদার পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞানীদেরকে) ফেকাহবিদদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেছেন। ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি অভ্যন্তরীণ পূর্ণতার ওপর একই রকম গুরুত্ব

[১১৪]. আল্ কুশাইরী প্রণীত 'রেসালাত কেতাব আল সামা' অধ্যায়, যা 'আল রাসায়েল আল কুশায়রীয়্যা' গ্রন্থে উদ্ধৃত; সিডোন ও বৈরুতস্থ আল মাকতাবা আল আসরিয়্যা ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৬০)।

[১১৫]. ইমাম আহমদ কৃত 'কিতাব আল ওয়ারা'- বৈরুত দারুল কিতাব আল আরবী ১৪০৯ হিঃ/১৯৮৮ ইং, পৃষ্ঠা ১০।

দিয়ে বলেন, "ধর্ম শুধু কিছু বর্ণনার সমষ্টি নয়, বরং অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার স্থাপিত নূর (আলো)-ই হলো দ্বীন"। হযরত ইবনে আরবী রহমতুল্লাহি আলাইহি-কে ইবনে আতাউল্লাহ উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন, "নিশ্চয় তা (অর্থাৎ, ঈমান) মস্তিষ্কের প্রমাণাদি থেকে বদ্ধমূল হয় না বরং অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত হয়"।

এ কারণে আমাদের ধর্মের অনেক মহান ইমাম নফস (কুপ্রবৃত্তি, একগুঁয়ে সত্তা)-এর প্রশিক্ষণ ছাড়া শুধু যাহেরী জ্ঞান চর্চার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। ইমাম গাযালী রহমতুল্লাহি আলাইহি রাজকীয় পদের ও আভিজাত্যপূর্ণ ক্যারিয়ারের মোহ ছেড়ে আত্মিক পরিশুদ্ধির প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত 'এহ্ইয়ায়ে উলুম আল দ্বীন' গ্রন্থের প্রথমেই সেই সব মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন, যারা শুধু ফেকাহকেই (ধর্মের বাহ্যিক আদশে-নিষেধসম্পর্কিত শাস্ত্র) ধর্ম মনে করে থাকেন।

প্রথম দিককার সূফী ও যুগের অন্যতম সেরা হুফফায (হাদীস শাস্ত্রের বিশারদ) হযরত সুফিয়ান সাওরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-ও একই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। ধর্মের জন্যে হাদীসের বর্ণনাকে যারা ব্যবহার করে, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "হাদীস যদি শুধু কোনো মাহাত্ম্য (মহৎ/ভালো গুণ) হতো, তাহলে তা হারিয়ে যেতো যেমনিভাবে ভালো কোনো কিছু তিরোহিত হয়েছে। হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়াস মৃত্যু-প্রস্তুতির অংশ নয়, বরং তা এমনই এক ব্যাধি যা মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে"। ইমাম যাহাবী এর ব্যাখ্যায় বলেন, "আল্লাহর শপথ! তিনি সত্য বলেছেন। আজকে আমাদের এই যুগে জ্ঞানান্বেষণ ও হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়নের মানে এখন আর এই নয় যে হাদীসের আলেমকে ওর আরোপিত বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে, যা হাদীসেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তিনি যা বলেছেন সত্য বলেছেন এই কারণে যে, হাদীস অধ্যয়নের প্রয়াস স্বয়ং হাদীস থেকে ভিন্ন"।[১১৬]

[১১৬]. ইমাম সাখাবী কৃত 'আল জওয়াহির ওয়া আল-দুরার ফী তারজামাতে শায়খ আল-ইসলাম ইবনে হাজর আল আসকালানী'- হামিদ আবদ আল-মাজীদ ও তোয়াহা আল-যায়নী সম্পাদিত; কায়রো –উইযারাত আল-আওকাফ, আল-মাজলিস আল-আলা লি আল-শূ'উন আল-ইসলামিয়্যা, লাজনাহ এহ্'ইয়া আল-তুরাস আল-ইসলামি ১৯৮৬; পৃষ্ঠা ২১-২২।

এই 'স্বয়ং হাদীসের' ওয়াস্তে, কুরআনের মর্মবাণী ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জীবনযাপনের খাতিরে, আত্মপরিশুদ্ধির মহান ইমামবৃন্দ দুনিয়ার মোহ হিসেবে জ্ঞানান্বেষণকে ত্যাগ করেন, আর এহসান তথা পূর্ণতাপ্রাপ্ত চরিত্র বৈশিষ্ট্য অর্জনকে শ্রেয় বিবেচনা করেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা-সম্পর্কিত হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীসের সাথে এই বিষয়টি সঙ্গতিপূর্ণ (হুযূরের চরিত্র সম্পর্কে মা আয়েশা বলেন, তাঁর চরিত্র কুরআনের বাস্তব রূপ)। এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলেন হযরত আবু নাসর বিশর আল হাফী রহমতুল্লাহি আলাইহি, যিনি হযরত ফুযায়ল ইবনে আয়ায রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর সোহবতে (সান্নিধ্যে) লাভকৃত সুদৃঢ় ঈমানের তুলনায় হাদীস অধ্যয়নকে থিওরী হিসেবে বিবেচনা করতেন [ইবনে সা'য়াদ রচিত 'তাবাকা', ৭(২)৮৩, আলুসী কৃত 'নাতাঈয আল-আফকার আল-কুদসিয়্যা' (বুলাক, ১৯২০/১৮৭৩); এবং আবদুল ওয়াহহাব শারাওয়ী প্রণীত 'আল-তাবাকাত আল-কুবরা ১:৫৭]।

এহসান ও তাতে পৌঁছাবার যে প্রক্রিয়া, উভয়ই তাসাউফ হিসেবে জ্ঞাত।

[সাত]

সূফীবাদের উৎস

Origins of Sufism (অরিজিন অপ সুফীজম)

সূফীবাদ হলো এমন একটি জ্ঞানের শাখা যা সমগ্র জগতের প্রভু খোদা তা'আলার নৈকট্য লাভের বিভিন্ন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়। এর আরও মানে হলো আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং প্রশংসনীয় গুণাবলী দ্বারা আত্মার বিভূষণ। সূফীবাদ এমন একটি পদ্ধতি যার মধ্যে সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হয়ে হক্ক তথা আল্লাহ তা'আলার শুহুদ অর্থাৎ দর্শনে বিভোর হয়। অতঃপর আল্ আসর তথা বিস্ময়ের জগতে প্রত্যাবর্তন করে। এর প্রারম্ভে হলো জ্ঞান, মধ্যবর্তী পর্যায়ে হলো কর্ম এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে খোদা তা'আলা হতে প্রাপ্ত অপরূপ সুন্দর উপহার।

ইতিহাসে দেখা যাবে সূফীবাদের চারটি প্রধান বিবর্তনকাল: (১) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের যমানা; (২) হাসান আল্ বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি, রাবেয়া আল্ আদাউইয়্যা রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ মহান সূফী ব্যক্তিত্বদের সময়কাল; (৩) এই সময়কালে সূফীবাদের বিভিন্ন তত্ত্বকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়; এবং (৪) সূফীবাদের কেন্দ্র ইরাকের বাগদাদ থেকে শুরু করে পূর্বে ইরান ও ভারত এবং পশ্চিমে (মাগরেব) ইউরোপের আন্দালুসিয়া (স্পেন) পর্যন্ত সূফীবাদের প্রচার-প্রসার করা হয় এই সময়কালে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের যমানায় 'সূফীবাদ' শব্দটি স্বতন্ত্র বা পৃথক কোনো শাস্ত্র হিসেবে বিরাজ করছিল না। বরঞ্চ এটা ইসলামের আধ্যাত্মিকতার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিরাজমান ছিল। "এটা ছিল এমন একটা বাস্তবতা যার কোনো নাম (সংজ্ঞা) ছিল না;" সাহাবীদের দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে আধ্যাত্মিক দীক্ষা (বায়াত) গ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে এর চর্চা তথা অনুশীলন চলছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাঁদের কাছে এর 'মূর্তমান মডেল' এবং অনুপ্রেরণার উৎস।

আহলুস্ সুফফা (নিচু বারান্দার মানুষ)-দেরকে ইতিহাসে প্রথম দিককার সূফী হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কেননা তাঁরা নিয়মিত যিকিরের সমাবেশ করতেন এবং নিচের আয়াতে করীমার আশীর্বাদ লাভের বিষয়বস্তুতে তাঁরা পরিণত হয়েছিলেন:

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

–এবং আপন আত্মাকে তাদেরই সাথে সম্পর্কযুক্ত রাখুন যারা সকাল সন্ধ্যায় আপন প্রতিপালককে আহ্বান করে, তাঁরই সন্তুষ্টি চায় এবং আপনার চক্ষুদ্বয় যেন তাদেরকে ছেড়ে অন্য দিকে না ফেরে; আপনি কি পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য কামনা করবেন? আর সেই ব্যক্তির কথা মানবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং সে আপন খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেছে, আর তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে।[১১৭]

অতএব এ কথা স্পষ্ট যে আমাদের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদায়ী আদেশ পেয়েছিলেন এ মর্মে যে তাঁকে সাহাবীদের ওই দলটির সাথে থাকতে হবে। আহলুস্ সুফফা যা অনেক মুসলমান ইতিহাসবিদদের মতে "সূফী" শব্দটির মূল, তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের একটি দলকে বোঝায়, যাঁদের অনেকে ভিনদেশী ছিলেন। যেমন, হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু এসেছিলেন ইথিওপিয়া থেকে; হযরত সালমান রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু পারস্য থেকে; হযরত সুহাইব রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু রোম থেকে। তাঁরা কুরাইশ গোত্র-প্রধানদের অনেক অত্যাচার-নিপীড়নের শিকার হন। তাঁদের পার্থিব গরিবী এবং তাঁদের উন্নত

[১১৭]. আল কুর'আন : আল কাহাফ, ১৮/২৮।

আধ্যাত্মিক মহাপ্রাণতা উভয়ই তাঁদেরকে "ফকির" হিসেবে বর্ণনা করার যোগ্যতা এনে দিয়েছে; ফকির হলেন এমন ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্ তা'আলার সামনে গরিব। ওই একই বিবেচনায় তাঁদেরকে "মুরিদ"-ও বলা চলে; কেননা একজন মুরিদ বলতে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানে উপনীত হতে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তিকে বোঝায়। এই শব্দটি কুরআনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (তাঁর চেহারার দর্শন পেতে ইচ্ছুক)। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে "يريد" ক্রিয়াটি যার অর্থ "ইচ্ছা পোষণ করা"। যে ব্যক্তি এ রকম ইচ্ছা পোষণ করেন তাঁকে মুরিদ বলা হয়।

সাইয়্যেদুনা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু হলেন আমাদের হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই, মেয়ের জামাই ও সাহাবী। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আধ্যাত্মিক সিলসিলার (চেইনের) প্রধান উৎস হলেন তিনি। অন্যান্য উৎসের মধ্যে রয়েছেন হযরত আনাস্ বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু এবং হযরত সালমান ফার্সী রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু।

তাসাউফ তথা সূফীতত্ত্ব ইসলামের আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ হাকীকত বা অন্তর্নিহিত সত্যকে নিয়ে চর্চা করে; ঠিক যেমনিভাবে শরীয়ত তার একমাত্র প্রকৃত উৎস নবুয়্যত নিয়ে ব্যাপৃত। এ কারণেই প্রথম প্রজন্মের সাধকদের সাধনাকে সূফীবাদের অন্তর্নিহিত বাস্তবতা অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছিল, যদিও ওই সময় "সূফীবাদ" শব্দটির প্রচলন ছিল না। এই প্রেক্ষিতে আল্ হুজউইরীর কথা উপলব্ধি করা সহজ; তিনি বলেন: "আজকে তাসাউফ হলো বাস্তবতাবিহীন একটি নাম, অথচ এটা ছিল নামবিহীন এক বাস্তবতা।" আল্ হুজউইরী আরও বলেন: 'সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের উত্তরসূরীদের সময় এই নামটির অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু এটা যে বাস্তবতার ইঙ্গিত বহন করতো তা তাঁদের প্রত্যেকেরই জানা ছিল।"

অতএব, সূফীবাদের নির্যাস ও নীতিমালাকে এর ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রকাশ থেকে পৃথক করা জরুরি। আল্ কুরআন ও তার প্রকৃত উৎস তথা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হতে উৎসারিত ঐশী আলো ও গোপন বিষয়াদি নিয়ে সূফীবাদ তত্ত্বচর্চা করে। এই বিশেষ কারণেই সূফীবৃন্দ তাসাউফ বিদ্যাকে খোদা তা'আলার নৈকট্য হতে উদ্ভূত জ্ঞান

হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন (ইলমে লাদুন্নী)। এই জ্ঞানের শাখাকে যওক তথা স্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে আহরিত হিসেবে সাধারণত বর্ণনা করা হয়; অর্থাৎ খোদা তা'আলার নৈকট্যের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার আলোকে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জ্ঞান সম্পর্কে বলেছিলেন, ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ "সে ঈমানের সুগন্ধের স্বাদ গ্রহণ করেছে"।[১১৮] এখানে উল্লেখ্য যে, সূফীবাদের কতিপয় বিরোধিতাকারী এর অস্বীকার করে থাকেন এ কথা বলে যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় সূফীবাদের অস্তিত্ব ছিল না। এই সমালোচকরা এটা বুঝতে অক্ষম যে ফিকাহ্, তাফসীর ইত্যাদি জ্ঞানের শাখার মতোই তাসাউফ তথা সূফীতত্ত্ব একটি জ্ঞানের শাখা। আল্ কুরআনের ঐশী বাণীতে ইতোমধ্যে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান সম্ভাবনাগুলোর বাস্তবায়নে এ সকল জ্ঞান সাহায্য করে থাকে। এগুলোর প্রায় একই সময়ে আবির্ভাবের কারণ হলো ঐশী বাণীতে প্রকাশিত নীতিমালা, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার আলো সম্পর্কে মুসলমান সমাজের প্রয়োজন পূরণ। উপরন্তু, সূফীবাদের বাস্তবতা-সম্পর্কিত 'হাদীসে জিবরীল' নামে খ্যাত প্রসিদ্ধ হাদীসে মহানবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এহ্সান (ঈমান ও নৈতিকতায় উৎকর্ষ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে এরশাদ ফরমান:

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

—আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী এমনভাবে করো যেন তুমি তাঁকে দেখছো; আর তুমি যদি তাঁকে না দেখতে পাও, তবে এটা জেনে তা পালন করো যে তিনি তোমাকে দেখছেন।[১১৯]

---

[১১৮]. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু যাকা তা'মী আল্ ঈমান, ১/৬২ হাদীস নং ৩৪।

[১১৯]. বুখারী : আস সহীহ, বাবু কাওলিহি, ইন্নাল্লাহা ইনদাহা ইলমুন, ৬/১১৫ হাদীস নং ৪৭৭৭।
(ক) মুসলিম : আস সহীহ, বাবু মা'রিফাতিল ঈমান ওয়াল ঈমান, ১/৩৬ হাদীস নং ৮।
(খ) ইব্ন মাজাহ : আস সুনান, বাবুল ঈমান, ১/২৪ হাদীস নং ৬৩।
(গ) আবূ দাউদ : আস সুনান, বাবু ফিল কৃদরি, ৪/২২৩ হাদীস নং ৪৬৯৫।
(ঘ) তিরমিযী : আস সুনান, ৪/৩০৩।
(ঙ) নাসায়ী : আস সুনান, ৮/৯৭, বাবু না'তিল ইসলাম, হাদীস নং ৪৯৯০।
(চ) আহ্মদ : আল মুস্নাদ, ১/৩৯৫।
(ছ) বায্যার : আল মুস্নাদ, ২/৯৯।

সূফীবৃন্দ ও উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, এই উৎকর্ষের মকাম বা মর্যাদা হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান চরিত্র ও শিষ্টাচার (মাকারীম আখলাক) অনুকরণকারীর আধ্যাত্মিক মকাম এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য সব কিছু থেকে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার পর্যায়/স্তর। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান চরিত্র অনুকরণ সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ও তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের চেয়ে আর কেউ এতো ভালোভাবে করতে পারেন নি। এ কারণে সূফীবৃন্দ নিশ্চিত যে সকল সাহাবী-ই প্রকৃত সূফী ছিলেন, 'সূফী' শব্দটির ঐতিহাসিক উৎস যাই হোক না কেন। সূফীবাদের ওপর ঐতিহ্যবাহী লেখনীতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও সূফী বিশ্বাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং সেগুলোর ভিত্তি, নীতিমালা, পদ্ধতি ও আধ্যাত্মিক আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কেও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এই ব্যাখ্যাগুলো উপকারী, কেননা এগুলো কেবল বিরূপ সমালোচনার জবাব-ই দেয় না, বরং যারা মজলিসে যিকরিল্লাহর তথা খোদ তা'আলার স্মরণের সমাবেশ তালাশ করেন এবং আধ্যাত্মিক মহব্বতের স্বাদ গ্রহণ করতে চান, তাদের মাঝে এগুলো আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে। প্রত্যেক যমানার সকল সূফী তরীকার এটাই হলো মূল উদ্দেশ্য। হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমাদের এ মযহাব (পথ) কুরআন ও সুন্নাহর নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের এই জ্ঞান মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়।" (রেসালায়ে কুশায়রীয়া)।

www.sufiway.net শীর্ষক ওয়েবসাইট থেকে 'সূফীবাদের উৎস' গৃহীত

[আট]

মওলানা রূমী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর দৃষ্টিতে প্রকৃত সূফী ও ভণ্ডের পার্থক্য

ভণ্ডরা সূফীবৃন্দের কথাবার্তা চুরি করে নিজেদের বলে চালিয়ে দেয়; আর এর ফলে তারা মানুষদেরকে সে সব সুন্দর শিক্ষাসমূহ দ্বারা ধোকা দেয়, যেগুলোর তারা অনুকরণকারীমাত্র। যে বিষয় সম্পর্কে তারা কথা বলে, সে ব্যাপারে কোনো প্রকৃত জ্ঞানই তাদের নেই। মহান সূফী মাশায়েখবৃন্দের অনেকেই প্রতারক ভণ্ডদের কথা উল্লেখ করেছেন - এ সব লোকেরা 'সূফী' খেতাবটি গ্রহণ করে, কেননা তা তাদেরকে বিশেষ মর্যাদা ও ক্ষমতা এনে দেয়; আর তারা সে সব মানুষের সাথে প্রতারণার আশ্রয় নেয় যারা প্রকৃত সূফীবাদী সিদ্ধপুরুষ ও ভণ্ড লোকের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে অক্ষম।

আল্লাহওয়ালা কোনো সিদ্ধপুরুষের দ্বারা প্রশিক্ষিত শিষ্যের আত্মা নির্মল ও পরিশুদ্ধ হয়। কিন্তু কোনো ভণ্ড ও কপট লোক দ্বারা প্রশিক্ষিত শিষ্য, যে নাকি ওই ভণ্ডের থিওরী শিখেছে, সে কেবল তার গুরুর মতোই হবে: ঘৃণ্য, দুর্বল, অক্ষম, গোমড়া-খিটখিটে স্বভাবের, অনিশ্চয়তা থেকে কখনোই মুক্ত নয়, এবং তার সকল ইন্দ্রিয়ে সে ঘাটতিপূর্ণ।

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ

–এবং কাফেরদের সাহায্যকারী হচ্ছে তাগুত (শয়তান, উপাস্য মূর্তি), যারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়।[১২০]

উপরন্তু, ভণ্ড ও তাদের ক্ষতি সম্পর্কে কবিতায় মওলানা রূমী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "তুমি হলে এমন একজনের শিষ্য ও অতিথি, যে ভণ্ড লোক তার জঘন্যতায় তোমার সমস্ত অর্জনকে চুরি করে নেবে। সে তো বিজয়ী (সফল) নয়, সে কীভাবে তোমাকে সাফল্যমণ্ডিত করবে? সে তোমায় আলোর দিশে দেবে না, বরং

---

১২০. আল কুর'আন : আল বাক্বারা, ২/২৫৭।
(ক) ফীহি মা ফীহি হতে সংকলিত; ডব্লিউ, সি, চিত্তিক কর্তৃক 'দ্য সূফী পাথ অফ লাভ: দ্য স্পিরিচুয়াল টিচিংস অফ জালালউদ্দীন রূমী' ১৪৫ পৃষ্ঠায় অনূদিত।

অন্ধকারাচ্ছন্ন করবে। তার যেহেতু কোনো আলো নেই, এমতাবস্থায় তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অন্যরা কীভাবে আলোর দিশে পেতে পারে? চোখের নিরাময়-প্রত্যাশী অন্ধের মতো সে তোমার চোখে পশম ছাড়া আর কী-ই বা দিতে পারবে? আল্লাহ তা'আলার সুঘ্রাণ বা খোঁজ ওই ভণ্ডের কাছে নেই, কিন্তু তার দাবিগুলো শীষ আলাইহিস সালাম বা আদম আলাইহিস সালাম-এর চেয়েও বড়। শয়তান স্বয়ং তার সামনে আসতে বিব্রত; ওই ভণ্ডরা বারংবার বলে, 'আমরাই সূফী-দরবেশ, বরং তার চেয়েও বড়।' দরবেশবৃন্দের অনেক বাণী ভণ্ড লোকটি চুরি করে থাকে, যার দরুণ মানুষেরা হয়তো ভাবে সে আসলেই কেউ একজন। তার কথাবার্তায় সে অকারণে এমন কি হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর খুঁতও ধরতে চায়; দুরাচারী এয়াযীদও তার সামনে শরমিন্দা হয়। কিন্তু ওই ভণ্ড বেহেস্তের রুটি ও খাদ্যসম্ভার হতে বঞ্চিত, দুঃস্থ; আল্লাহ তা'আলা তাকে একটি হাড়-ও ছুঁড়ে দেন নি (কুকুরের সামনে যেমনি খাবার ছোঁড়া হয়)।"[১২১]

অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মওলানা জালালউদ্দীন রূমী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো মহান শায়খ (পীর)-ও ভণ্ডদের ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। অতীতের চেয়ে বর্তমানকালে ভণ্ডদের দৌরাত্ম্য বেশি। তাই শরীয়ত-মান্যকারী প্রকৃত সূফী-দরবেশবৃন্দকে শরীয়ত অমান্যকারী ভণ্ডদের কাছ থেকে পৃথকভাবে আমাদের চিনতে শিখতে হবে।

[১২১]. মওলানা রূমী রহমতুল্লাহি আলাইহি : 'মসনবী শরীফ', ১ম খণ্ড, পংক্তি ২২৬৫-২২৬৮, ৭২-৭৬, প্রাগুক্ত 'দ্য সূফী পাথ অফ লাভঃ দ্য স্পিরিচুয়াল টিচিংস অফ জালালউদ্দীন রূমী', ১৪৫-১৪৬পৃষ্ঠা।

[নয়]

কামেল পীরের কাছে বায়া'ত হবার আবশ্যকতা

Initiation of a Shaykh (spiritual guide)

–কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

মহান প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার নামে আরম্ভ করছি। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি জানাচ্ছি অসংখ্য সালাত ও সালাম। তাঁর খাঁটি ও নির্মল আহলে বায়ত (পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন), আসহাবে কেরাম (সম্মানিত সাথীবৃন্দ), আয্ওয়াজে মোতাহ্হারাত (পবিত্র বিবিগণ), সালাফে সালেহীন (পূর্ববর্তী বুযূর্গানে দ্বীন), মোতা'খেরীন (পরবর্তী যুগের পুণ্যবান জ্ঞান বিশারদবৃন্দ), বুযূর্গানে দ্বীন ও আউলিয়ায়ে কামেলীনের প্রতিও জানাচ্ছি আমাদের শত সহস্র সালাত-সালাম। বিশেষ করে মহান আউলিয়ায়ে কেরাম, কুতুবে যমান জনাব কাজী আসাদ আলী সাহেব কেবলা রহমতুল্লাহি আলাইহি, হাজতে রওয়া, মুশকিল কোশা, সুলতানুল মোনাযেরীন হযরতুল আল্লামা শাহ্ সূফী আবুল মোকারেম মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম সাহেব কেবলা রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং আমার পীর ও মুরশিদ হযরতুল আল্লামা শাহ্ সূফী সৈয়দ আবু জাফর মুহাম্মদ সেহাবউদ্দীন খালেদ সাহেব কেবলা রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রতি আন্তরিক সালাম ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে এ লেখার প্রয়াস পাচ্ছি।

সৃষ্টির আদিতে রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলা ছিলেন রহস্যের গুপ্ত ভাণ্ডার। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে কুদসীতে তিনি এরশাদ ফরমান-

"আমি ছিলাম রহস্যের গুপ্ত ভাণ্ডার। অতঃপর প্রকাশ হওয়ার বিষয়টি মনস্থ করলাম।" তাঁর এ প্রকাশ হবার প্রক্রিয়ায় তিনি ধরণীর বুকে তাঁরই খলীফা বা প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্তটি পাক কালামে ঘোষণা করেছেন। এরশাদ হয়েছে–

إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً

–আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণকারী।[১২২]

[১২২]. আল কুর'আন : আল বাক্বারা, ২/৩০।

আয়াতোল্লিখিত "প্রতিনিধি" শব্দটিকে তাফসীর গ্রন্থসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার নবী-রাসূল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে আরম্ভ করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলই মহান আল্লাহ পাকের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহ্ পাকের মূল খলীফা বা প্রতিনিধি তা অপর এক হাদীসে কুদসীতে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান- "হে রাসূল! আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি আসমানসমূহ তথা বিশ্বজগত সৃষ্টি করতাম না।" আমাদের উদ্ধৃত দুটো হাদীসে কুদসীতে প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হতে চেয়েছিলেন।

মাধ্যম দ্বারাই আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন। পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান তার সবই কোনো না কোনো মাধ্যম দ্বারা জারি হয়েছে বা আছে। বস্তুতঃ মহান স্রষ্টা এভাবেই সৃষ্টি প্রক্রিয়া জারি করেছিলেন এবং এখনো তা জারি আছে। আল্লাহ্ পাক কুরআন মজীদে এরশাদ ফরমান–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ

–হে মু'মিন (বিশ্বাসী)-গণ! আল্লাহকে ভয় করো (অর্থাৎ, পরহেযগার হও তথা সওয়াবদায়ক আমল পালন করো আর হারাম বর্জন করো) এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্যে ওসীলা বা মাধ্যম অন্বেষণ করো।[১২৩]

মওলানা সূফী আবদুল হাকিম আরওয়াছী তুর্কী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কৃত 'রাবেতায়ে শরীফা' শীর্ষক পুস্তিকায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "ওসীলাটি যে প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তা সূরা আলে ইমরানের ৩১ আয়াতে বর্ণিত ঐশী আদেশে জানানো হয়েছে–

إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ

[১২৩]. আল কুর'আন : আল মায়িদাহ, ৫/৩৫।

–যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।[১২৪]

'উলামায়ে হাক্কানী নবী আলাইহিস সালাম-গণের উত্তরাধিকারী'- হাদীসটি পরিস্ফুট করে যে আউলিয়াগণও ওসীলা"।[১২৫]

বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলার ফয়েয ও মারেফাত অত্যন্ত তাজাল্লীপূর্ণ, ঠিক আগুনের মতো। কেউ যদি রুটি বানিয়ে সরাসরি আগুনে দেয়. তাহলে তা পুড়ে যাবে। কিন্তু যদি সে রুটি সেকার জন্যে তাবা ব্যবহার করে, তাহলে রুটি পুড়বে না। ঠিক তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার ফয়েয ও মারেফত অন্তরে গ্রহণ করতে হলে একজন কামেল পীর-মুরশিদের প্রয়োজন, যিনি তাঁর মুরীদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলার নূরের তাজাল্লী সহ্য করার ও গ্রহণ করার সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা করতে সক্ষম। মুরীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, এ ক্ষেত্রে তার পীরের সাথে আত্মিক যোগাযোগ বজায় রাখা এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া। অর্থাৎ, তাকে নিজ পীরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখতে হবে এবং পূর্ণ আস্থাশীল হতে হবে।

কামেল (পূর্ণতাপ্রাপ্ত) পীরের কাছে বায়া'ত হওয়া অপরিহার্য। কেননা, সূরা মায়েদাতে ওসীলা গ্রহণের আয়াতটি আজ্ঞাসূচক। এক্ষণে বায়া'ত হবার বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবো। আরবী 'বায়া'ত' শব্দের অর্থ বিক্রি হয়ে যাওয়া। এর ব্যবহারিক অর্থ কোনো কামেল পীরের কাছে ইসলামী প্রথানুযায়ী মুরীদ হওয়া বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করা। এই ইসলামী প্রথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় থেকেই চালু হয়েছে। কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে–

لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ

–নিশ্চয় আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন ঈমানদারদের প্রতি যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে বায়া'ত গ্রহণ করছিলো।[১২৬]

[১২৪]. আল কুর'আন : আলে ইমরান, ৩/৩১।
[১২৫]. রাবেতায়ে শরীফা।
[১২৬]. আল কুর'আন : আল ফাত্হ, ৪৮/১৮।

একইভাবে সূরা ফাতহ ১০নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ

–ওই সব মানুষ যারা আপনার কাছে বায়া'ত গ্রহণ করছে, তারা তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছেই বায়া'ত গ্রহণ করছে; তাদের হাতগুলোর ওপর রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের হাত।[১২৭]

বায়া'তের এই ইসলামী প্রথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেসাল তথা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে পরলোকে মিলিত হবার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু, হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু, হযরত ওসমান যিন্নুরাইন রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু এবং তারও পরে তরীকতের পীর-মাশায়েখবৃন্দ জারি রাখেন। বায়া'ত কীভাবে গ্রহণ করা হতো তার বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করতেন: তোমরা আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দাও ও শপথ করো যে তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, অবৈধ যৌনাচার করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, একে অপরের কুৎসা রটনা (গীবত) থেকে বিরত থাকবে, পাপাচার থেকে বিরত থাকবে; আর যে ব্যক্তি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে, তার জন্যে পুরস্কার সর্বশক্তিমান ও মহান আল্লাহর তরফ থেকে থাকবে।' অতঃপর আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দিতাম ও শপথ করতাম" (আল্ বুখারী ও মুসলিম)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু এ বিষয়ে বলেন: "আমরা যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে (খোদায়ী আজ্ঞা) শোনার ও মানার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতাম, তখন তিনি বলতেন, 'তোমাদের সাধ্যানুযায়ী' (আল্ বুখারী ও মুসলিম)।

[১২৭] প্রাগুক্ত ৪৮/১০।

বায়া'তের ইসলামী প্রথা সম্পর্কে দেওবন্দী মৌলভী আবুল হাসান নদভীও তার 'রিজালুল ফিকর ওয়াদ্ দাওয়া' পুস্তকের ২৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেছে, "সূফী তরীকার গাউস, হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি, হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং নকশবন্দী সিলসিলার পীর-মাশায়েখবৃন্দ বায়া'তের দরজা যতোটুকু সম্ভব উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, যাতে করে প্রত্যেক সত্য ও একনিষ্ঠ বিশ্বাসী ব্যক্তি তাঁর জন্যে আত্মিকভাবে মূল্যবান কোনো বস্তু খুঁজে পান এবং সবাই যেন সর্বশক্তিমান ও মহান আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তাঁদের (পূর্ব) প্রতিশ্রুতির নবায়ন করতে পারেন। নকশবন্দী সিলসিলার এবং অন্যান্য সূফী তরীকার পীর-মাশায়েখবৃন্দ তাঁদের মুরীদদেরকে এমন এক সত্যবাদিতার মাকামে (পর্যায়ে) উন্নীত করেছিলেন, যেখানে তারা বায়া'তের দায়িত্ব উপলব্ধি ও অনুভব করতে পেরেছিলেন এবং নিজেদের বিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।"

কামেল পীরের বৈশিষ্ট্য

একজন কামেল পীরের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে প্রথমটি হলো তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা (কুরবাত) ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নায়েব (প্রতিনিধি) হিসেবে দ্বীনের (ধর্মের) যাহেরী (প্রকাশ্য) এবং বাতেনী (আধ্যাত্মিক) জ্ঞানে একজন আলেম বা জ্ঞান বিশারদ হতে হবে। মোট কথা, ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর অগাধ জ্ঞান থাকতে হবে। তাঁকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কেও জানতে হবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁকে আরেফ বা ভেদের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞানী হতে হবে। তাঁর ইহ্সান অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে, যেমন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ .

–আল্লাহর এবাদত এমনভাবে করো যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো, আর যদি না দেখতে পাও তবে এটি জানো যে তিনি তোমাকে দেখছেন।[১২৮]

[১২৮]. বুখারী : আস সহীহ, বাবু কাওলিহি, ইন্নাল্লাহা ইনদাহা ইলমুন, ৬/১১৫ হাদীস নং ৪৭৭৭।

একজন আরেফ তাঁর অন্তরে সাক্ষ্য দেবেন যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর যাত মোবারক, গুণাবলী ও কর্মে এক ও অনন্য। তৃতীয়তঃ কামেল পীর তাঁর পীরের তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যেই পরিশুদ্ধ। তাঁকে নফস তথা একগুঁয়ে সত্তার বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়, রোগ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে হবে। শয়তান কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে কলব্ বা অন্তরে প্রবেশ করতে পারে তাও তাঁকে জানতে হবে। তাঁর মুরীদদের পরিশুদ্ধ করা এবং কামেলিয়াত বা পূর্ণতার পর্যায়ে উন্নীত করার সকল পদ্ধতিও তাঁর জানা থাকা প্রয়োজন। চতুর্থতঃ তরীকতের পথে অনুসারীদের পথ দেখানোর ক্ষেত্রে একজন কামেল পীরের প্রয়োজন তাঁর পীর কেবলার এজাযত বা অনুমতি। বস্তুতঃ একজন কামেল পীরের বৈশিষ্ট্য ও গুণ হলো তাঁকে দেখলেই আল্লাহর কথা স্মরণ হবে, তাঁর কথাবার্তা শুনলে ঈমান সজীব ও চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

(ক) মুসলিম : আস সহীহ, বাবু মা'রিফাতিল ঈমান ওয়াল ঈমান, ১/৩৬ হাদীস নং ৮।
(খ) ইব্ন মাজাহ : আস সুনান, বাবুল ঈমান, ১/২৪ হাদীস নং ৬৩
(গ) আবূ দাউদ : আস সুনান, বাবু ফিল ক্বদরি, ৪/২২৩ হাদীস নং ৪৬৯৫।
(ঘ) তিরমিযী : আস সুনান, ৪/৩০৩।
(ঙ) নাসায়ী : আস সুনান, ৮/৯৭, বাবু না'তিল ইসলাম, হাদীস নং ৪৯৯০।
(চ) আহ্মদ : আল মুস্নাদ, ১/৩৯৫।
(ছ) বায্যার : আল মুস্নাদ, ২/৯৯।

[দশ]

বেলায়াত (ওলীত্ব) ও কুরবাত (নৈকট্য)

শায়খ আহমদ হেনড্রিকস্ (দক্ষিণ আফ্রিকা)

ওলী-এর অর্থ

সূফীবাদকে অনেক সময় সমালোচনা করা হয় এ মর্মে যে, এতে নাকি আউলিয়ায়ে কেরাম ও বুযূর্গানে দ্বীনের প্রতি "মাত্রাতিরিক্ত" সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এ সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হলো মূলতঃ আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার-দরগাহ যেয়ারতকে কেন্দ্র করে আচরিত কিছু রীতি, যা কারো ধারণায় মকরূহ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমালোচনা ওলীত্বের মকাম (মর্যাদা)-কে কেন্দ্র করে নয়। গুটি কয়েক শাফেয়ী মযহাবের আলেম এ সব প্রথার কয়েকটিকে যদিও বা মুনকার কিংবা মকরূহ্ বলেছেন, তথাপি অন্যান্য আলেমে হক্কনী-রব্বানীবৃন্দ তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম খায়রুদ্দীন রমলী রহমতুল্লাহি আলাইহি এ মত পোষণ করেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি হালত্ (আধ্যাত্মিক ভাব) অবস্থায় অথবা আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো ওলীর মাযারে নিজেকে সমর্পণের উদ্দেশ্যে মাটিতে পড়ে যায়, তাহলে তাঁর এ কাজ মুনকার নয়, মকরূহ্ও নয়; শেরক (অংশীবাদ) তো কোনোক্রমেই নয়। ইমাম রমলী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মতানুযায়ী ওই ব্যক্তির অবস্থা হযরত সাইয়্যেদুনা বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মতো, যিনি সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা শরীফে নিজের মুখমন্ডল ঘষেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেসালের সময় তিনি সিরিয়ায় ছিলেন।

"সংস্কারের" নামে সোচ্চার কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে ইদানীং যে নতুন প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা হলো, এ সব আচার ও প্রথাকে 'শেরক' বলে আখ্যা দেয়া। তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গি 'ঈমান' ও 'আমল' বিষয়ক সংজ্ঞার বা ধারণার ব্যাপারে একটি মৌলিক বিভ্রান্তি পরিস্ফুট করে। সত্য কথা হলো, আমল (কর্ম) কখনোই শেরক হতে পারবে না, যদি না তার সাথে মুশরেকী বিশ্বাস বা মনোভাব কাজ করে। এ ক্ষেত্রেও 'কর্ম' শেরক নয়, বরং 'বিশ্বাস' বা মনোবৃত্তি-ই হলো শেরক। 'আমল' বা

কর্মকে শেরক বলা ভুল যুক্তি। যদি তা সঠিক হতো, তবে হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু-ও একজন মুশরিক হতেন (নাউযুবিল্লাহ্)।[১২৯] কুরআনে বর্ণিত ফেরেশতাবৃন্দ কর্তৃক হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে সম্মান প্রদর্শন এবং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইদের দ্বারা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনও একই বিবেচনার আওতায় পড়তো।

বিতর্কের কোনো বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমরা বেলায়াতের মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই। বেলায়েতের মকাম (মর্যাদা) কেন এতো কাঙ্ক্ষিত? ওলী বলতে কী বোঝায় এবং আউলিয়ায়ে কেরাম কি কারামত প্রদর্শন করেন? কেউ ওলী হলে তা কি তিনি জানতে পারেন? মানুষেরা প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন, "আমরা শুনে থাকি যে ওলীবৃন্দের বিভিন্ন শ্রেণী বিন্যাস এবং পদ বিন্যাসও আছে; এ কথা কি সত্য"?

এ বিষয়ে আমরা প্রথমে কিছু কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ বিশ্লেষণ করবো: হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহা থেকে ইমাম আবদুল করীম কুশাইরী রহমতুল্লাহি আলাইহি একটি হাদীসে কুদসী বর্ণনা করেন যা'তে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- "আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: যে ব্যক্তি কোনো ওলী (আল্লাহর বন্ধু)-কে আঘাত দেয়, সে আমার সাথে যুদ্ধ করাকে বৈধ জ্ঞান করেছে। আমার বান্দা আর কোনো এবাদত দ্বারা এমন নৈকট্য পান না যা তিনি পান ফরয এবাদত দ্বারা; নফল এবাদত পালন করে তিনি আমার আরও নিকটবর্তী হন; এতোখানি হন যে আমি তাঁকে ভালোবাসি। আমি কদাচিৎ কোনো কিছু করতে দ্বিধান্বিত হই- যতোটা না দ্বিধান্বিত হই আমার বিশ্বাসী বান্দার জান কবজ করতে; কেননা তিনি মৃত্যুকে অপছন্দ করেন আর আমিও অপছন্দ করি ক্ষতি করতে; কিন্তু মৃত্যু থেকে রক্ষা নেই।"

ইমাম নববী রহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত একখানা হাদীসে কুদসী রেওয়ায়াত করেন

[১২৯]. হযরত খালেদ বিন যায়দ আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতেও অনুরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় - অনুবাদক।

যা'তে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا، فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.

–যে ব্যক্তি আমার ওলীর প্রতি আঘাত দেয়, আমি তার প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা আর কোনো এবাদত দ্বারা এমন নৈকট্য পায় না যা তিনি পান ফরয এবাদত পালনের মাধ্যমে; নফল এবাদত পালন করে তিনি আমার আরও নিকটবর্তী হন, এতোখানি হন যে আমি তাঁকে ভালোবাসি। আর আমি যখন তাঁকে ভালোবাসি, আমি তাঁর কুদরতী কান হই যা দ্বারা তিনি শুনেন; তাঁর কুদরতী চোখ হই যা দ্বারা তিনি দেখেন; তাঁর কুদরতী হাত হই যা দ্বারা তিনি কাজ করেন; তাঁর কুদরতী পা হই যা দ্বারা তিনি চলাফেরা করেন। তিনি আমার কাছে কিছু চাইলে তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর করি; আমার কাছে আশ্রয় চাইলে তাও দেই।[১৩০]

ইবনে হিব্বান রহমতুল্লাহি আলাইহি ও নাসায়ী রহমতুল্লাহি আলাইহি উভয়েই বর্ণনা করেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- "আল্লাহর বান্দাদের এমন একটি দল রয়েছেন যাঁদেরকে এমন কি (অন্যান্য) নবীবৃন্দ ও শুহাদা (শহীদ)-বর্গও ঈর্ষা করবেন।" এমতাবস্থায় কেউ একজন জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এঁরা কারা, যাতে করে

[১৩০]. বুখারী : আস সহীহ, বাবুত তাওয়াদ্বুউ, ৮/১০৫ হাদীস নং ৬৫০২।
(ক) বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, ৫/১৯ হাদীস নং ১২৪৭।

আমরা তাঁদেরকে ভালোবাসতে পারি"? অতঃপর হুজুর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "তাঁরা এমনই একদল মানুষ, যারা আল্লাহ্ তা'আলার নূরের আলোকে পরস্পরকে ভালোবাসেন, অর্থ কিংবা পারিবারিক বন্ধনের কারণে নয়। তাঁদের চেহারা নূরে পরিপূর্ণ এবং তাঁরা নূরের মিম্বরে আরোহণ করেছেন। মানুষেরা যখন ভয় পায় তখন তাঁরা ভয় পান না; মানুষেরা যখন সন্তাপ করে, তখনও তাঁরা তা করেন না।" এর পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিচের আয়াতটি তেলাওয়াত করেন–

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

অর্থঃ আল্লাহর আউলিয়াবৃন্দের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা শঙ্কাগ্রস্ত হবেন না।[১৩১]

আয়াতোল্লিখিত 'আউলিয়া' শব্দটি হলো 'ওলী' শব্দের বহুবচন। এ শব্দটি দুটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আরবী ভাষায় সাধারণতঃ 'ওলী' শব্দের অর্থ হলো বন্ধু, সহযোগী, মিত্র। এ অর্থে প্রত্যেক মো'মেন মুসলমান-ই আল্লাহর ওলী, কেননা তিনি আল্লাহকে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর দ্বীনের সাথে নিজেকে সহযোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করেন। মুসলমানদের প্রতি সাধারণভাবে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের জন্যে ইমাম আহমদ যাররুক আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে আমরা এ অর্থেও ওপরে উদ্ধৃত হাদীসগুলো উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ্ তা'আলা কোনো ওলীকে আঘাতদানকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে থাকেন। অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব ও আচরণ পরিহারে এটাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট ভয়-ভীতির হুমকি হওয়া উচিৎ। তবে ওলী শব্দটির আরও সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে যা নিচে দেয়া হলো:

(ক) এমন মুসলমান-ই হলেন ওলী, যিনি আল্লাহর এবাদতকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি কোনো পাপ না করে নিয়মিত এবাদত পালন করেন; কেননা তিনি পাপ থেকে (প্রায় পুরোপুরিভাবে) নিজেকে মুক্ত করে ফেলেছেন। কিংবা,

[১৩১]. আল কুর'আন : ইউনুস, ১০/৬২।

(খ) এমন কোনো মুসলামন যাকে আল্লাহ পাক কবুল করে নিয়েছেন এবং নিজ হেফাযতে নিয়েছেন, যেমনিভাবে কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে- أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ "আমি উদ্ধার করে নিয়েছি ওই সব নেককার মানুষকে যারা অসৎ কর্ম থেকে নিবৃত্ত করতেন"।[১৩২] এ আয়াতে প্রতিভাত হয় পূণ্যবান মুসলমানদেরকে আল্লাহ তা'আলা গুনাহ থেকে হেফাযত করেন। এরই ফলশ্রুতিতে উলামায়ে কেরাম বলেন, নবীবৃন্দের অবস্থা হলো তাঁরা মা'সুম (নিষ্পাপ); আর ওলীবৃন্দের হলো তাঁরা মাহ্ফুয (পাপ হতে হেফাযতপ্রাপ্ত)।

বেলায়াত অর্জনে শরীয়তের প্রাধান্য

ওপরের আলোচনার ধারাবাহিকতায় বিষয়টির ক্ষেত্রে একটি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন ইমাম কুশাইরী রহমতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বলেছেন, 'কোনো ওলীকে 'ওলী' হতে হলে প্রথমে উভয় বর্ণিত বৈশিষ্ট্য পূরণ করা অবশ্য কর্তব্য বা বাধ্যতামূলক: তাঁর জন্যে মহান আল্লাহ্ পাকের হক পুরোপুরিভাবে আদায় করা অবশ্য কর্তব্য; এর পাশাপাশি সকল পরিস্থিতিতে, তা ভালো হোক বা মন্দ, আল্লাহর হেফাযত পাওয়াও তাঁর জন্যে অবশ্য কর্তব্য।" ইমাম কুশাইরী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'রেসালা' শীর্ষক বেলায়াত-সম্পর্কিত দিকদর্শক পুস্তকে বলেন, "শরীয়তে যার সম্পর্কে আপত্তি আছে, সে ব্যক্তি বিভ্রান্তিতে পড়বে ও ধোকা খাবে।"

এসব উদ্ধৃতির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর একটি হলো শরীয়তের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন। মৌলিক তাসাউফ শরীয়তের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সূফী মতবাদ শরীয়তের 'উর্ধ্বে' মর্মে ব্যতিক্রমী কথাবার্তা যা অজ্ঞদের কাছ থেকে শোনা যায় বা পূর্ববর্তী প্রাচ্যদেশীয় তাত্ত্বিকদের মতামতে বিধৃত হয়েছে, তা ভ্রান্তি ও অনবহিত অবস্থার প্রমাণবহ। দ্বীন ইসলামের মহান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি হলো, শরীয়ত ও এর পূর্ণ তাবেদারি এবং এতদসংক্রান্ত জ্ঞান-ই খোদা তা'আলার সান্নিধ্য পাবার মাধ্যম। উদাহরণস্বরূপ, সালাত (নামায)-কে আমরা খোদাপ্রদত্ত চাবি ও মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করবো যা দ্বারা আমরা তাঁর সান্নিধ্যে 'ভ্রমণ' করতে সক্ষম।

[১৩২]. আল কুর'আন : আল আ'রাফ, ৭/১৬৫।

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেন- 'সালাত প্রত্যেক মো'মেন মুসলমানের জন্যে মে'রাজস্বরূপ।" এ হাদীসে তিনি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তুলনা দিয়েছেন তা আমাদের লক্ষ্য করা উচিৎ। এক মুহূর্তের জন্যে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবো। সালাত হচ্ছে কোনো মো'মেন মুসলমানের জন্যে একটি মহা আধ্যাত্মিক যাত্রা; যাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মে'রাজ রজনীর যাত্রার সাথে তুলনা করা হয়েছে- যেখানে তিনি মক্কায় অবস্থিত মসজিদুল হারাম থেকে যাত্রা শুরু করে জেরুজালেমে অবস্থিত মসজিদুল আকসায় গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে আল্লাহ্ তা'আলার একেবারেই কাছে চলে গিয়েছিলেন; এতো কাছে যে সেখানে ফেরেশতাবৃন্দও যেতে পারেন না। হুজুর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই যাত্রা ছিল তাসাউফের পথে পথিকদের চিরন্তন অন্বেষণের পূর্বসূচনা এবং এই হাদীসের মর্মানুযায়ী প্রত্যেক মো'মেন মুসলমানের জন্যেই তা অন্বেষণের বিষয় হওয়া উচিৎ। স্বাভাবিকভাবে আমাদের মতো সাধারণ নারী-পুরুষের পক্ষে শারীরিক বা আধ্যাত্মিকভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতো আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করা সম্ভব নয়। মূল বিষয়টি হলো, সালাত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছ থেকে প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে আগত একটি উপহার যার মাধ্যমে আল্লাহর অনুপম ও আশীর্বাদপুষ্ট নৈকট্য লাভ করা সম্ভব– অনেকটা মেরাজ রজনীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাভ করা অভিজ্ঞতার মতোই।

গোটা শরীয়ত সম্পর্কেও একই রকম মন্তব্য করা যায়। একটি হাদীস শরীফে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আল্লাহ্ বলেন: আমার বান্দার জন্যে নৈকট্য অন্বেষণের সর্বোত্তম পন্থা হলো আমি যা তাঁর প্রতি ফরয (মা এফতারাদতু আলাইহে) করেছি তা নিরন্তর অনুশীলন করা।" এখানে আমরা একটি বিষয়ের প্রতি দ্রুত দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো আর তা হলো, আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে সালাত, রোযা, হজ্জ ও যাকাতই শুধু দ্বীন ইসলামের ফরায়েয (অবশ্য কর্তব্য) নয়। অন্যান্য ফরযের মধ্যে রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, নিজ স্ত্রী, সন্তান ও প্রতিবেশীদের প্রতি সদাচরণ; ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক লেনদেনের সময়

ন্যায়পরায়ণতা ও সততা; রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধর হলে তাতেও ন্যায়পরায়ণতা ও সততা অবলম্বন; দ্বীনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধে অসীম সাহসিকতা; অন্তরের ও মস্তিষ্কের পবিত্রতা এবং তাতে হিংসা-বিদ্বেষ, দম্ভ ও কপটতা বা কুটিলতার অনুপস্থিতি ইত্যাদি। শরীয়ত এগুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছে। এ সবেরই মূলনীতি হলো, আমরা যতোক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার শরীয়তকে আমাদের জীবনে পূর্ণতা না দেবো ও বাস্তবায়ন না করবো, ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনোক্রমেই আমরা তাঁর রেযামন্দি তথা সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবো না এবং তাঁর নৈকট্য পাবো না। মুতকাদ্দিমীন তথা পূর্ববর্তী যমানার উলামায়ে হককানী আরও এক কদম বেড়ে এসব ফরযের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত সুন্নাহ এবং এমন কি শরীয়তের সকল আদবকেও যোগ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার বর্ণনা নিচে দেয়া হলো:

হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি একবার এমন কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন যাকে তাঁর পরিচিতজন ও শিষ্যরা একজন "ওলী" হিসেবে বর্ণনা করেন। যখন তিনি সেই "ওলীর" মসজিদে পৌঁছুলেন, তখন তিনি বসে গেলেন তাঁর অপেক্ষায় - ওই ব্যক্তির কাজ শেষ হওয়া না পর্যন্ত। ব্যক্তিটি মসজিদ ত্যাগের সময় বাইরে নয়, বরং মসজিদের ভেতরে থুথু ফেললো। হযরত বায়েযীদ রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে সালাম না জানিয়েই ওই স্থান ত্যাগ করেন। স্বাভাবিকভাবেই এ ঘটনায় আলোড়ন সৃষ্টি হলো, কেননা হযরত বায়েযীদ রহমতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন একজন বিশেষভাবে খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব যাঁর আধ্যাত্মিক মকাম ও পাণ্ডিত্য তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে সর্বজনবিদিত ছিল। মানুষজন এর কারণ হন্যে হয়ে জানতে চেষ্টা করলো যে, কেন এই লোককে হযরত বায়েযীদ রহমতুল্লাহি আলাইহি অবজ্ঞা করলেন। অতঃপর তিনি উত্তর দিলেন, "শরীয়তের আদবসমূহের একটির বেলায় যদি এই ব্যক্তির ওপর আস্থা না রাখা যায়, তাহলে আল্লাহর মা'রেফতের (ভেদের রহস্যের) ক্ষেত্রে কীভাবে তার ওপর নির্ভর করা যাবে?"

আউলিয়ার প্রতি ভালোবাসা

কোনো ওলী একদিকে যেমন আল্লাহ পাকের করীব বা নিকটে, তেমনি তিনি মুকাররব তথা নিকটবর্তীও। তিনি নিজ প্রচেষ্টায় শরীয়ত পালন

করে আল্লাহর নিকটবর্তী হন, যার প্রতিদানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সাহায্য করেন ও সুরক্ষিত রাখেন এবং তাঁর কাছে টেনে নেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– "আল্লাহ্ বলেন: আমি আমার বান্দার চিন্তার মধ্যে রয়েছি; তিনি যদি নিজ হতে আমাকে স্মরণ করেন, আমিও তাঁকে নিজ হতে স্মরণ করবো; আর যদি তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেন, তবে আমি তাঁর হাতের কাছে অগ্রসর হই; আর যদি তিনি আমার দিকে হাতের কাছে পৌঁছে যান, তাহলে আমি তাঁর বাহুর নিটকবর্তী হই; তিনি আমার দিকে হাঁটতে থাকলে আমিও তাঁর দিকে বাতাসের বেগে ধাবিত হই।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তিনি আমাকে স্মরণ করলে আমিও তাঁর সাথে থাকি।"

এ হাদীসে কুদসীটি অর্থে সমৃদ্ধ। যারা আল্লাহর বাতেনী জ্ঞানের রাস্তা তালাশ করেন এবং তাঁরই নৈকট্য চান, তাঁদের জন্যে এখানে প্রচুর উৎসাহের খোরাক রয়েছে। "আমি আমার বান্দার চিন্তার মধ্যে রয়েছি" এবং অন্যত্র বর্ণিত "বান্দা আমাকে স্মরণ করলে আমিও তাঁর সাথে থাকি"- হাদীসে কুদসীগুলো দুটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ আদব ব্যক্ত করে। প্রথমতঃ আমাদের এবাদত পলানকালে আল্লাহর প্রতি 'হুসনু যন্নি' তথা নির্মল ও বিশুদ্ধ চিন্তা এবং অবিচল আস্থা নিয়ে তা আমাদের করা উচিত। বস্তুতঃ চিন্তায় বিশুদ্ধতা নিজেই একটি এবাদত। আল্লাহর প্রতি হুসনু যন্নি-র অর্থ তাঁর ইচ্ছাকে পুরোপুরিভাবে মেনে নেয়াও। এ পথের পথিকের উচিৎ কঠোর পরিশ্রম দ্বারা খোদা তা'আলার প্রতি সকল প্রকার ক্ষোভ মন থেকে অপসারণ করা। আল্লাহ্ অন্যান্যদেরকে দান করেন এবং আমাদের তা দানে বিরত থাকতে পারেন।

আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার প্রতি অসন্তুষ্টি এবং তাঁর প্রতি ক্রোধে ফেটে পড়াই হলো হিংসা-বিদ্বেষের মূল। দ্বিতীয়তঃ আমরা যেহেতু তাঁর হুজুরে (উপস্থিতিতে) রয়েছি এবং তিনিও আমাদের সাথে রয়েছেন, সেহেতু তাঁর প্রতি সর্বাধিক মনোযোগ দেয়ার আদব আমাদের মেনে চলতে হবে। এটি কষ্টসাধ্য হলে কিংবা এবাদতের সময় একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি মনোনিবিষ্ট হওয়া সম্ভব না হলে আমাদের হয় নিজেদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে, নয়তো এ প্রশিক্ষণদানে সক্ষম এমন কাউকে খুঁজে বের করার

প্রয়োজন হবে। কুরবাত তথা নৈকট্যের মকাম ও বেলায়াতের মকাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে উভয় মকামই একান্তভাবে কাম্য হওয়া উচিৎ। ওপরে উদ্ধৃত হাদীসে কুদসীতে পরিস্ফুট হয় যে আমরা যে 'গতি' ও 'উদ্যমে' আল্লাহর দিকে ধাবিত হই, তিনি তার চেয়েও বেশি গতি ও উদ্যমে আমাদের কাছে আসেন।

'হাদীসুল আউলিয়া' খ্যাত রওয়ায়াতে তথা বিবরণে আউলিয়ায়ে কেরামের সুউচ্চ মকাম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে নিজস্ব রক্ষণাবেক্ষণে রাখেন এবং সাহায্য করেন। আউলিয়ায়ে কেরামকে যে ব্যক্তি ভালোবাসে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই ভালোবাসে। আর এর বিপরীতে যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হয়, তার বিরুদ্ধে "আল্লাহ্ যুদ্ধ ঘোষণা করেন"; এই হাদীসে কুদসী আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু হতে ইমাম বুখারী বর্ণিত। অন্য একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান- "যে ব্যক্তি আউলিয়াকে আঘাত দেয়, সে আমার সাথে যুদ্ধ করাকে হালাল জ্ঞান করেছে" (হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম আহমদ ও ইমাম কুশায়রী বর্ণিত)। ইমাম তাবারানী রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত এতদসংক্রান্ত রেওয়ায়াতগুলোতে মূলতঃ শব্দগত পার্থক্য বিদ্যমান; তাতে আরও কিছু কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা যুক্ত রয়েছে যা অন্যান্যদের বর্ণনায় নেই। এসব রেওয়ায়াতের পূর্ণ বিশ্লেষণ এই স্বল্প পরিসরে করা সম্ভব নয়, তাই তা অন্য সময় ও স্থানে করার ইচ্ছা রইলো। এখানে শুধু রেওয়ায়াতগুলোর উত্থাপিত কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা জরুরি বিবেচনা করা হয়েছে।

১. এ হাদীসে কুদসী থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি আর তা হলো, আউলিয়ায়ে কেরামকে ভালোবাসা অবশ্য কর্তব্য। তাঁদেরকে অপছন্দ করা বা আঘাত দেয়া নিষিদ্ধ। খোদা তা'আলা কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার চেয়ে বড় কোনো শাস্তি নেই। অবশ্য কর্তব্য ও নিষিদ্ধ হওয়ার উপরোক্ত বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় এতো বড় শাস্তির বিষয়টি থেকেই। কথা বা কাজে আউলিয়ায়ে কেরামকে আঘাতদানকারীর বিরুদ্ধে আল্লাহ্ পাক যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অতএব, তাঁদেরকে আঘাত দেয়া নিষিদ্ধ এবং এরই ফলশ্রুতিতে তাঁদেরকে সম্মান করা ও ভালোবাসা অবশ্য কর্তব্য। তাঁরা ইসলাম ধর্মের প্রকৃত রূপের

প্রতিনিধিত্বকারী এবং শরীয়তের পূর্ণ প্রতিফলনকারী। আর এর প্রতিদানস্বরূপ তাঁরা আল্লাহর প্রিয়ভাজন বান্দা।

আবু তোরাব নকশাভী এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তুলে ধরেছেন: "যদি অন্তর আল্লাহর প্রতি শত্রুতাভাব পোষণ করে, তবে তা আউলিয়ার সমালোচনা ও তাঁদের প্রতি ঘৃণাসহ আবির্ভূত হয়েছে" (ইমাম কুশায়রী বর্ণিত)। প্রত্যেক মুসলমান যিনি আল্লাহকে ভয় পান এবং নিজ দ্বীন হেফাযতে সচেতন, তিনি এ ব্যাপারে সতর্ক হবেন। কিছু কিছু গোষ্ঠীর তরফ থেকে হক্কানী-রব্বানী উলামায়ে কেরাম ও বুযূর্গানে দ্বীন এবং সর্বোপরি সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সমালোচনা ও বৈরিতা যা আমরা শুনতে পাই তা সত্যি উদ্বেগের বিষয়।

ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমান শাফেয়ী রহমতুল্লাহি আলাইহি, সাইয়্যেদুনা গাউসে আযম আবদুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম গাযযালী রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং তাঁদের মতো অন্যান্য বুযূর্গানে দ্বীন যদি আল্লাহর আউলিয়া না হন, তাহলে কারা আউলিয়া হবেন; তাঁদের মতামতের বিজ্ঞ (আলেমানা) আলোচনা-সমালোচনা এক জিনিস, আর তাঁদেরকে হেয় করা, খাটো করা হলো ভিন্ন আরেক জিনিস। আবু তোরাবের মতানুযায়ী, এগুলো হলো আরও গভীর ও বিপজ্জনক প্রবণতার লক্ষণ। এই ঘৃণা ও বৈরিতার কারণ সমালোচকদের অন্তরে খুঁজতে হবে এবং যাঁদেরকে তারা সমালোচনা করছে তাঁদের মাঝে এটা খোঁজার প্রয়োজন নেই।

২. এ রওয়ায়াতের আরেকটি মৌলিক বিষয এই যে, আল্লাহর নৈকট্যের মকামের রাস্তা হলো শরীয়ত: 'মা এফতারাদতু আলাইহি' অর্থাৎ, "আমার নৈকট্যের সর্বোত্তম পথ হলো ফরয অনুশীলন করা"; উপরন্তু, এরশাদ হয়েছে- "আমার বান্দা নফল অনুশীলন করে আমার এতো নিকটবর্তী হয় যে আমি তাকে ভালোবাসি।" আল্লাহর নৈকট্যের মকাম ও বেলায়তের মকামের রাস্তা হলো ফরায়েয (ফরযসমূহ) ও নওয়াফেল (নফলসমূহ), যা বিস্তারিতভাবে শরীয়তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতএব, শরীয়ত হলো ওই সব শিক্ষা, তরীকত ওগুলোর অনুশীলন এবং নৈকট্য হলো মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। পথের শুরুতে রয়েছে নিজ সত্তার ওপর শরীয়ত জারি করার সংগ্রাম (মোজাহাদা), আর শেষে রয়েছে আল্লাহর

নৈকট্যের মকামে উন্নীত হয়ে তাঁর মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য দর্শন (মোশাহাদাহ্)। তাই তাসাউফের পথে অগ্রসর হতে চান এমন সবার উচিৎ শরীয়তকে শিক্ষা ও উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয় প্রয়াস পাওয়া।

আমরা আগেই বলেছি যে সালাত (নামায), রোযা ও হজ্জ-ই কেবল দ্বীন ইসলামের ফরয এবাদত নয়, বরং এতে আরও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা যা সমভাবে গুরুত্বের দাবিদার । এ ক্ষেত্রে জানতে হলে ইমাম নববী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর রিয়াযুস সালেহীন গ্রন্থটি প্রণিধানযোগ্য।

৩. নৈকট্যের মকাম (মাকামুল কুরব্) দুভাগে বিভক্ত: কুরব্ ফরায়েয (ফরযসমূহের নৈকট্য) ও কুরব্ নওয়াফেল (নফলসমূহের নৈকট্য)। এগুলো সম্পর্কে পরবর্তী কোনো সময়ে আলোচনা করার আশা রইলো, ইনশা-আল্লাহ!

[এপ্রবন্ধটি www.sunnah.org/tasawwuf/sainthood.htm ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত। লেখক মক্কা মোকাররমার বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন শায়খ মুহাম্মদ আলাউয়ী মালেকীর ছাত্র ও ভাবশিষ্য এবং মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সনদপ্রাপ্ত।]

[এগার]
পীরের প্রতি মুরীদের পালিত আদব

মাহমুদ কাশানী প্রণীত মিসবাহে হেদায়া ওয়া মিফতাহে কেফায়া শীর্ষক ফার্সী গ্রন্থের অধ্যায় হতে

ইংরেজি অনুবাদক- মুহাম্মদ সিরাজ এলশট (হল্যান্ড)

জেনে রাখো: মুরীদের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলোর একটি হলো তার শায়খ তথা পীরের প্রতি আদবশীলতা রক্ষার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া; কেননা, এই আচরণ-সচেতনতা অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে। এটা বাস্তব যে তোমার আচার-ব্যবহারের সৌন্দর্যের মাঝে তোমার আত্মার সৌন্দর্য ও তোমার মেধা বা বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণতা দৃশ্যমান হয়। তুমি সর্বদা তোমার শায়খের প্রতি আদবশীল হলে তাঁর অন্তরে তোমার প্রতি ভালোবাসা পয়দা হবার ফলে সেখানে তোমার একটি স্থানও নির্দিষ্ট হবে; আর এরই ফলশ্রুতিতে খোদা তা'আলার করুণাও তোমার প্রতি বর্ষিত হবে। মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্ধু (ওলী)-দের অন্তরগুলোতে রহমত (করুণা) ও যত্নের দৃষ্টি রাখেন। মুরীদ যদি পীরের অন্তরে স্থায়ী আসন করে নিতে পারে, তবে স্থায়ী খোদায়ী করুণা ও আশীর্বাদ তারই প্রাপ্য হবে। তোমার শায়খ কর্তৃক তোমাকে কবুল করার চিহ্ন হবে এই যে তোমার প্রতি তাঁর আর কোনো আপত্তি থাকবে না, যা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সকল পীর-মাশায়েখ যাঁরা তোমার শায়খ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যকার সিলসিলাগত যোগসূত্র, তাঁদের কাছে তোমার কবুল হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

শুধু সুন্দর আদব-কায়দা ও আচরণ দ্বারাই তোমার পীরের প্রতি কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করা যায়। ধর্মীয় জ্ঞান বিশারদ তথা পীর মাশায়েখবৃন্দ যাঁরা তোমাদের রূহানী পিতা, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তোমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পন্ন করো। এতে অবহেলা চরম অবজ্ঞা ও অমান্য করার প্রবণতা ছাড়া আর কিছু নয়। একটি হাদীসে আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- "যে ব্যক্তি মুরুব্বীদের সম্মান করে না এবং ছোটদের আদর করে না এবং উলামায়ে হক্কানী-রব্বানীদের হক তথা অধিকার স্বীকার

করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" তুমি যদি তোমার শায়খের অধিকারকে অবহেলা করো, যিনি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাঁর অধিকার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার অধিকারের প্রতিনিধিত্ব করেন, তবে তুমি খোদা তা'আলার প্রতি কর্তব্য পালনেও ব্যর্থ হবে; কেননা, "তোমার মুরশিদের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করলে তুমি আল্লাহর কাছে পৌঁছুতে পারবে না।" একজন শায়খ তাঁর মুরীদানদের মধ্যে সেই রকম হেদায়াতকারী যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের মাঝে। যখন পীর সাহেব তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ অনুসরণের আহ্বান জানান, তখন তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিনিধি। যথা- এরশাদ হয়েছে:

"আশ্ শায়খু ফী কওমিহী কান্ নবীয়্যে ফী উম্মাতিহী"

অর্থাৎ, "একজন পীর তাঁর (অনুসারী সিলসিলাধারী) মুরীদানদের জন্যে সেই রকম হেদায়াতকারী, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের মাঝে।"

আমার জ্ঞানে বর্তমানে মুরীদের জন্যে পনেরোটি আদব রয়েছে যা সে তার পীরের প্রতি পালন করবে। এ আদবগুলো একাধারে আম (সার্বিক) ও খাস্ (সুনির্দিষ্ট) উভয়ই।

প্রথম আদবটিতে এই বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে যে তোমার জ্ঞান অর্জন, হেদায়েত (পথ প্রদর্শন), প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা-দীক্ষা সবই তোমার পীর দেখা শোনা করবেন। তুমি যদি কাউকে তাঁর সাথে তুলনীয় মনে করো বা ওই ব্যক্তিকে আরও পূর্ণতাপ্রাপ্ত মনে করো, তাহলে বোঝা যাবে তোমার শায়খের সাথে তোমার ভালোবাসা ও টানের সম্পর্ক দুর্বল এবং এই কারণেই তোমার পীরের কথা ও তাঁর আধ্যাত্মিক হাল বা অবস্থাগুলো তোমার ওপর সামান্য প্রভাব ফেলবে। তাঁর কথা ও আদেশকে তোমার ওপর প্রভাব ফেলতে হলে এবং তাঁর হালতগুলোকে তোমার উপলব্ধি করতে হলে যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হলো মুহব্বত (ভালোবাসা)। তোমার ভালোবাসা যতো বেশি পূর্ণতা পাবে ও গভীর হবে ততোই তাঁর শিক্ষাগুলো তোমার বোধগম্য হতে থাকবে।

দ্বিতীয় আদবটি হলো তোমার শায়খের আদেশ-নিষেধ মান্য করার বেলায় তোমার স্থির সিদ্ধান্ত ও অটল থাকা। তোমার এটা জানা উচিৎ যে, তাঁকে মানা ও তাঁর খেদমতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মাঝেই খোদায়ী করুণার দ্বার অবারিত হবে। 'হয় আমি পীরের দোরগোড়ায় জান দেবো, নয়তো লক্ষ্যে পৌঁছাবো।' এর লক্ষণ হলো, যখন পীর সাহেব তোমাকে কোনো বিষয়ে 'না' বলেন বা দূরে সরিয়ে দেন, তখন তুমি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। কেননা, তোমার আধ্যাত্মিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে সময়ে সময়ে তিনি তোমাকে পরীক্ষা করবেন।

আবু উসমান হিরী (বেসাল ২৯৮ হিজরী/৯৬০-১১ খৃষ্টাব্দ; খোরাসানী সূফীদের নক্ষত্র) তাঁর পীর শাহ কেরমানী (বেসাল ৩১০ হিজরী, ৯১২/৯১৩ খৃষ্টাব্দ; আবু তোরাব নক্‌শাবীর মুরীদ)-এর আদেশ অনুসারে আবু হাফসে হাদ্দাদ (বেসাল ২৭০ হিজরী, ৮৮৩/৪ খৃষ্টাব্দ বা তারও আগে; তিনি মালামাতিয়া তথা দায় বহনের তরীকার অনুসারী)-কে দেখতে নিশাপুরে আসেন। আবু হাফসে হাদ্দাদের ঐশী পরশময় চাহনি আবু উসমানকে এতোই আকর্ষণ করলো যে তিনি তাঁর জালে আটক হয়ে গেলেন। নিশাপুর থেকে ফেরার সময় হলে আবু উসমান তাঁর পীর শাহ কেরমানীর কাছে নিশাপুরে থাকার অনুমতি চান। এ সময় তিনি তাঁর পূর্ণ যৌবনে ছিলেন। আবু হাফস্ হাদ্দাদ অবশ্য তাঁকে দূরে সরিয়ে দিলেন এ কথা বলে, "আমার সোহবতে (সান্নিধ্যে) বসার কোনো অনুমতি তোমার নেই।" আবু উসমান এই সিদ্ধান্ত মেনে তাঁকে সামনে রেখে পেছনের দিকে হেঁটে বেরিয়ে এলেন যতোক্ষণ না শায়খ আবু হাফস্ দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। অতঃপর আবু উসমান শায়খের দরজার বাইরে একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে বসে গেলেন এই নিয়্যতে যে আবু হাফস্ তাঁকে না গ্রহণ করা ও না ডাকা পর্যন্ত তিনি সেখান থেকে নড়বেন না। আবু হাফস্ তাঁর এ নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়্যত দেখে তাঁকে কাছে ডাকলেন ও তাঁর বিশেষ সঙ্গীদের একজন হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করলেন; অতঃপর তাঁকে নিজ কন্যার সাথে বিয়ে দিলেন ও উত্তরাধিকারী হিসেবে খেলাফত দান করলেন। শায়খের বেসালের পরে আবু উসমান ত্রিশ বছর সাজ্জাদানশীন খলীফা ছিলেন।

তৃতীয় আদবটি হলো, তোমার শায়খের পছন্দ-অপছন্দের মাঝে নিজেকে তুমি সমর্পিত করবে। মুরীদ হিসেবে তোমার ব্যক্তিগত বিষয়ে কিংবা মালিকানাধীন সম্পদের ব্যাপারে তোমার পীরের প্রতিটি সিদ্ধান্ত তোমাকে মেনে চলতে হবে এবং এতে সমর্পিত ও সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এটাই একমাত্র পথ যা দ্বারা তুমি তাঁর অমূল্য মনোযোগ আকর্ষণ ও ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হবে। তোমার আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা পরিমাপের এটাই হলো মাপকাঠি- যেমনিভাবে আল্ কুরআনে বিবৃত হয়েছে–

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ

–অতএব, হে মাহবুব! আপনার প্রতিপালকের শপথ, তারা মুসলমান হবে না যতোক্ষণ পরস্পরের ঝগড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক না মানবে; অতঃপর যা কিছু আপনি নির্দেশ করবেন, তাদের অন্তরসমূহে সে সম্পর্কে কোনো দ্বিধা থাকবে না এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেবে"।[১৩৩]

চতুর্থ আদব শর্তারোপ করে যে তুমি তোমার পীরের সমালোচনা করবে না। নিজ পীরের পছন্দ-অপছন্দ ও সিদ্ধান্তগুলোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া মুরীদের উচিৎ নয়- তা অন্তরে হোক বা প্রকাশ্যেই হোক। তোমার পীরের কোনো কিছু অস্পষ্ট মনে হলে সর্বদা মূসা আলাইহিস সালাম ও খিযির আলাইহিস সালাম-এর ঘটনাটির কথা স্মরণ করবে (সূরা কাহাফ, ৬০-৮২ আয়াতসমূহ)। এতে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবী ও মহাজ্ঞানী এবং খিযির আলাইহিস সালামের প্রতি ভক্ত-অনুরক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কিছু কাজের সামলোচনা করেছিলেন; কিন্তু ওগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ জানার পর নিজ ধারণা পরিবর্তন করেছিলেন। তোমার শায়খের কোনো কাজ যদি তোমার বোধগম্য না হয়, তবে তোমার বলা উচিৎ যে তোমার উপলব্ধি ক্ষমতা ও জ্ঞান সীমাবদ্ধ; আর এটি কোনোক্রমেই তোমার

[১৩৩]. আল কুর'আন : আন নিসা, ৪/৩৫।

পীরের ভুল-ত্রুটি বা ভ্রান্ত আচরণের ব্যাপার নয়। ফলে তোমার পীরের সাথে তোমার সম্পর্কে ফাটল ধরার সম্ভাবনা থেকে তুমি মুক্ত থাকবে এবং তাঁর মুহব্বতেও ঘাটতি পড়বে না। একবার হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি (বেসাল ৯১০ খৃষ্টাব্দ)-কে জনৈক মুরীদ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে এবং তাঁর উত্তর পাবার পরে এর সমালোচনা করে। হযরত জুনাইদ রহমতুল্লাহি আলাইহি তখন কুরআন মজীদের একটি আয়াতে করীমা পড়ে শোনান:

وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾

–আর তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না করো, তাহলে আমার কাছ থেকে সরে যাও।[১৩৪]

পঞ্চম আদবটি হলো, তুমি তোমার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ পরিহার করবে। পীর কী চান বা কী পছন্দ করেন তা না জেনে মুরীদের কোনো কাজই করার অনুমতি নেই- চাই সেই কাজ হোক ধর্মীয় বা বৈষয়িক, আম (সার্বিক) কিংবা খাস (সুনির্দিষ্ট)। তাঁর অনুমতি ছাড়া তুমি পানাহার করবে না, সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় পরবে না, উপহার দেবে না, ঘুমোবে না, কিছু নেবেও না, দেবেও না। তোমার শায়খের অনুমতি ও নির্দেশ ছাড়া কোনো ধর্মীয় কাজেও জড়াবে না। এক রাতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুর বাসার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন; এমতাবস্থায় তিনি হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুকে রাতের নামাজে নিচু স্বরে কুরআন তেলাওয়াত করতে শুনতে পেলেন। অতঃপর তিনি হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুর বাসার পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁকে রাতের নামাযে উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করতে শুনলেন। সকালে যখন উভয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলেন, তিনি হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন কেন তিনি নিচু স্বরে কুরআন তেলাওয়াত করেছিলেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু উত্তর দিলেন, "আমি যাঁর সাথে আলাপ করি তাঁর কথা শুনি।" হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুকে তাঁর উচ্চস্বরে

[১৩৪]. আল কুর'আন : আদ দুখান, ৪৪/২১।

কুরআন তেলাওয়াতের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিন উত্তর দেন, "আমি শয়তানকে তাড়িয়ে দেই এবং যারা ঘুমোয় তাদেরও জাগিয়ে দেই।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের দুজনকে উচ্চস্বর বা নিচু স্বর কোনোটিতেই তা করতে বারণ করলেন বরং মধ্যম রাস্তা অনুসরণ করতে বললেন। এমতাবস্থায় কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলো–

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا

–এবং আপন নামায না খুব উচ্চস্বরে পড়ো, না একেবারে ক্ষীণ স্বরে এবং এই দুয়ের মধ্যবর্তী পথ সন্ধান করো।[১৩৫]

এতে প্রমাণিত হয় যে তোমার যদি আধ্যাত্মিক পীর তথা পথপ্রদর্শক থাকেন, তবে তোমার উচিৎ হবে না নিজের উপলব্ধি অনুযায়ী চলা। এটা আধ্যাত্মিক জগতের প্রকৃত উপলব্ধির বেলায়ও প্রযোজ্য হবে।

ষষ্ঠ আদবটি হলো, তোমার শায়খের চিন্তাধারাকে মেনে চলতে হবে। শায়খের চিন্তা-ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করে, এমন কোনো কিছুতে মুরীদের ব্যাপৃত হওয়া উচিৎ নয়। তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করা তোমার উচিৎ নয়। কেননা, তোমার শায়খের দয়া, সম্পূর্ণ ক্ষমা, বন্ধুত্ব ও ক্ষমাশীলতার ওপর তুমি নির্ভরশীল। শায়খের সচেতন মনে প্রত্যাখ্যান কিংবা গ্রহণের কারণে যা কিছু প্রবেশ করে তা মুরীদের সত্তার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

সপ্তম আদব তোমার কাছে এটা দাবি করে যে তুমি স্বপ্নে যা দেখ তা তুমি তোমার পীরকে বলবে ও সেগুলোর ব্যাখ্যা চাইবে। স্বপ্নের ব্যাখ্যার ব্যাপারে পীরের ওপর নির্ভর করবে; হতে পারে এসব স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায় কিংবা ঘুমে। এগুলোতে কোনো ক্ষতি নেই মর্মে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেবে না। এ সব স্বপ্ন হয়তো তোমার আত্মার গোপন আকাঙ্ক্ষা থেকেও সম্ভব হতে পারে এবং তুমি সেগুলোকে সেভাবে বিচার নাও করতে পারো ও ক্ষতিকর নাও মনে করতে পারো। এটা প্রকৃত চিত্র নাও হতে পারে। তবে তুমি যখন তোমার পীরকে এগুলো সম্পর্কে বলবে এবং তিনি তাঁর সুগভীর জ্ঞান দ্বারা এগুলোর সাথে

[১৩৫]. আল কুর'আন : আল ইসরা, ১৭/১১০।

পরিচিত হবেন, তখন বাস্তবিকভাবে এগুলো কখন ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে তোমার পীরের মতামত তোমাকে সাহায্য করবে। এটা যখন আঘাতের ইঙ্গিত বহন করবে, তখন তাও বোঝা যাবে।

অষ্টম আদবটি তোমার কাছে এটা দাবি করে যে তুমি তোমার পীরের কথা কান দিয়ে শুনবে। শায়খের ঠোঁট থেকে যা বের হয়ে আসবে তা শোনার জন্যে মুরীদের উচিৎ অপেক্ষা করা ও তাতে মনোযোগী হওয়া। তার উচিৎ নিজ শায়খের জিহ্বাকে খোদা তা'আলা ভাষণের অভিব্যক্তি মনে করা এবং এই বিশ্বাস পোষণ করা যে তিনি নিজ আকাঙ্ক্ষা হতে কিছু বলেন না, বরং যা বলেন তা "খোদা বান্দার মাধ্যমে কথা বলেন" এমন মাকামে উন্নীত হয়েই ব্যক্ত করেন। তোমার উচিৎ তাঁর হৃদয়কে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মণিমুক্তাসমৃদ্ধ একটি মহাসাগর মনে করা; যে মহাসাগর প্রাক-অনন্তকালের খোদায়ী ইচ্ছার বায়ুপ্রবাহে এসব রত্নের কিছু কিছুকে পীরের সৈকতসম জিহ্বায় ভাসিয়ে নিয়ে আসে।

অতএব, তোমার উচিৎ এ ব্যাপারে যত্নবান ও মনোযোগী হওয়া, যাতে করে তোমার জন্যে উপকারী হতে পারে পীরের এমন কথা শোনা থেকে তুমি বঞ্চিত না হও।

তোমার নিজের হাল তথা অবস্থার সাথে তোমার পীরের প্রতিটি কথাকে তুমি সমন্বয় সাধন করতে চেষ্টা করবে। এ কথা তুমি চিন্তা করবে যে খোদার দরবারে তোমার কল্যাণের জন্যে তুমি একটি দরখাস্ত পেশ করছো গ্রহণোন্মুখ জিহ্বা সহকারে; আর এই গ্রহণোন্মুখতার পরিপ্রেক্ষিতে গায়েব থেকে তোমার প্রতি একটি ভাষণ অবতীর্ণ হয়েছে। নিজ পীরের সাথে কথা বলার সময় তুমি নফসানীয়াত (একগুঁয়ে সত্তা) ত্যাগ করবে; নিজ জ্ঞান ও ঐশী অন্তর্দৃষ্টিকে সদ্ব্যবহার করে তোমার উচিৎ হবে কপটতা ত্যাগ করা এবং নিজেকে পূর্ণ ও সুন্দর হিসেবে পেশ করা। কেননা, যখন তুমি নিজেকে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করবে ও কথা বলার সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে, তখনই তুমি নিজেকে মুরীদের অবস্থান থেকে সরিয়ে ফেলবে এবং শায়খের কথা শোনার ক্ষেত্রে নিজেকে বধির বানিয়ে ফেলবে। কুরআনের আয়াত–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

'হে ঈমানদারবৃন্দ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে বেড়ো না'।[১৩৬]

এ আয়াতের শানে নুযূল তথা প্রেক্ষাপট হিসেবে কিছু কিছু তাফসীরকার উলামা লিখেছেন যে, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্যে এমন কিছু মানুষ ছিলেন যারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কেউ কোনো প্রশ্ন করলে উত্তর হিসেবে নিজেদের মতামত পেশ করার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হয়ে তা যে ভুল ও নিষিদ্ধ তা প্রমাণ করেছে।

নবম আদবটি শর্তারোপ করে যে তুমি তোমার কণ্ঠস্বর পীরের উপস্থিতিতে নিচু ও মোলায়েম রাখবে। তাঁর সান্নিধ্যে কখনো উচ্চস্বরে কথা বলবে না; কেননা এটা সৌজন্যের খেলাফ। এটা আপন মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করার মতোই ব্যাপার। এ শিক্ষাটা দেয়ার জন্যেই কুরআনের আয়াত নাযেল হয়েছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ

–হে ঈমানদারবৃন্দ! নিজেদের কণ্ঠস্বরকে ওই অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)-র কণ্ঠস্বরের চেয়ে উঁচু করো না।[১৩৭]

অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের কণ্ঠস্বর এতোই নিচু করেন যে তাঁদের কথাবার্তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় কুরআনের আয়াত নাযেল হয়–

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾

–নিশ্চয় ওই সমস্ত মানুষ যারা আপন কণ্ঠস্বরকে আল্লাহর রাসূলের দরবারে নিচু রাখে, তাদেরকে আল্লাহ পাক তাদের খোদাভীরুতার বেলায় পরীক্ষা করে নিয়েছেন; তাদের জন্যে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রয়েছে।[১৩৮]

---

[১৩৬]. আল কুর'আন : আল হুজুরাত, ৪৯/১।
[১৩৭]. আল কুর'আন : আল হুজুরাত, ৪৯/২।
[১৩৮]. আল কুর'আন : আল হুজুরাত, ৪৯/৩।

দশম আদবটি তোমাকে তোমার আচরণে অবহেলা প্রদর্শন করতে বারণ করে। তোমার শায়খের সাথে কথায় বা কাজে খুব ফ্রি বা খোলামেলা আচরণ অনুমতিপ্রাপ্ত নয়; কেননা তাতে বিনয়ীভাব তিরোহিত হবে এবং যথাযথ আচরণও দূর হয়ে যাবে এবং এরই ফলশ্রুতিতে করুণা প্রবাহও বিঘ্নিত হবে। তোমার উচিৎ হবে তাঁকে সম্মানসহ সম্বোধন করা, যেমন- ইয়া শায়খী (হে আমার পীর) ইত্যাদি।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রথম দিকে তাঁকে সম্বোধনের সময় সম্মানসহ তা করতেন না। তাঁরা বলতেন 'মুহাম্মদ' কিংবা 'আহমদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। এমতাবস্থায় এটা নিষেধ করে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়:

لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

–রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্বোধন করার সময় সেভাবে চিৎকার করো না যেভাবে একে অপরের প্রতি করে থাকো, যাতে তোমাদের আমলসমূহ বরবাদ না হয়ে যায়।[১৩৯]

অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্' (হে আল্লাহর রাসূল) বলে সম্বোধন করতেন। বানু তামীম গোত্রের কতিপয় প্রতিনিধি একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরের সামনে গিয়ে জোরে চিৎকার দিয়ে বলে, "হে মুহাম্মদ! আমাদের কাছে বেরিয়ে আসুন!" এতে কুরআনের আয়াত নাযেল হয়–

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا۟ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

[১৩৯]. আল কুর'আন : আল হুজুরাত, ৪৯/২।

–নিশ্চয় ওই সব লোক যারা আপনাকে হুজরাসমূহের (প্রকোষ্ঠ) বাইরে থেকে আহ্বান করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ এবং যদি তারা ধৈর্য ধারণ করতো আপনি তাদের কাছে বের হওয়া পর্যন্ত, তবে তা তাদের জন্যে ভালো হতো।[১৪০]

তোমার পীরের সাথে কথাবর্তা বলার সময় যেমন তুমি খোলামেলা হবে না, তেমনি কাজে কর্মেও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে তোমার কর্তব্য মনে করবে। তাই পীরের দরবারে তোমার জায়নামাজ শুধু নামাযের সময় হলেই বিছিয়ে দেবে। তাঁর সামনে সূফীবৃন্দের সেমা (কাওয়ালী/মরমী সংগীত) শোনার সময় যতোক্ষণ তোমার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে, ততোক্ষণ চিৎকার বা ওয়াজদ (দৈনিক স্পন্দন) করবে না। হাসাহাসিও করবে না।

এগারোতম আদব তোমার প্রতি শর্তারোপ করে যে, কথা বলার সঠিক সময়টুকু তোমার জানা প্রয়োজন। মুরীদ যখন ধর্মীয় বা বৈষয়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলাপ করতে চায়, তখন তার উচিৎ এটা দেখে নেয়া যে তার পীর এ ব্যাপারে তার মূল্যবান সময় দিতে রাজি আছেন কিনা; অর্থাৎ, তিনি মুরীদের কথা শুনতে ইচ্ছুক কিনা। তোমার শায়খের সাথে কথা বলার সময় তোমার তাড়াহুড়ো করা উচিৎ নয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা কামনা করো যাতে করে আদব পালনের ক্ষেত্রে কোনো ভুল-ত্রুটি না হয়ে যায়, কোনো বেয়াদবী না হয়ে যায়। এ সময় খোদা তা'আলার এতো নিকটবর্তী হওয়ার কারণে পীরের দরবারে হাদিয়া পেশ করা যথোচিৎ হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারেও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাঁর কাছে কিছু আরয করার আগে এ রকম হাদিয়া পেশ করতেন, যেমনিভাবে কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে; أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ "হে ঈমানদারবৃন্দ! তোমরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কোনো কথা গোপনে আরয করতে চাও, তবে তা করার আগে কিছু সাদকাহ্ (হাদিয়া) পেশ করো (রাসূলের কাছে)"।[১৪১]

[১৪০]. আল কুর'আন : আল হুজুরাত, ৪৯/৫।
[১৪১]. আল কুর'আন : আল মুজাদিলাহ, ৫৮/১২।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকার শিরোমণি হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু (বেসাল- ৬৮৭/৬৯০ খৃষ্টাব্দ) বলেন: "এ আয়াতটি অবতীর্ণ হবার কারণ হলো মানুষেরা হুজুর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাজির হয়ে মাত্রাতিরিক্ত পীড়াপীড়িমূলক প্রশ্ন করতো এবং তাঁকে পেরেশান করতো।"

বারোতম আদব দাবি করে যে তুমি তোমার আধ্যাত্মিক মকামের সীমানাগুলো পাহারা দেবে। পীরকে প্রশ্ন করার সময় মুরীদের উচিৎ নিজ মকামের সীমা বজায় রাখা। শুধু তোমার আধ্যাত্মিক অবস্থা-সম্পর্কিত তোমার কাছ থেকে গোপন বা আড়াল যে কোনো বিষয় সম্পর্কেই তুমি তাঁর কাছে ব্যাখ্যা চাইতে পারবে। অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করো না; এটা তোমার মকাম বা হালের সাথে সম্পর্কিত এমন বিষয়গুলোর বেলায়ও প্রযোজ্য। অতএব, এগুলো সম্পর্কে পীরের সাথে আলাপ করো না; কেননা এগুলো উপকারী নয়, এমন কি ক্ষতিকরও হতে পারে। তোমার আধ্যাত্মিক অবস্থার সাথে যা কিছু জড়িত শুধু সে সম্পর্কেই প্রশ্ন করবে। এ ধরনের বাহুল্য প্রশ্নের ব্যাপারে কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ "হে ঈমানদারবৃন্দ! তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যেগুলো তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে"।[১৪২] উপকারী কথা হলো তা-ই যা শ্রোতার উপলব্ধি ক্ষমতার অনুকূল। আর উপকারী প্রশ্ন হলো তা-ই যা উত্তর শ্রবণকারীর মকামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তেরোতম আদব হলো তুমি তোমার পীরের গোপন রহস্য সম্পর্কে চুপ থাকবে। অলৌকিক ক্ষমতা, স্বপ্ন ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক বিষয় যা তোমার পীর গোপন রেখেছেন, তা প্রকাশ করার জন্যে তুমি অনুমতি চাইবে না। কেননা, এগুলো গোপন রাখার মাঝে তোমার পীর কোনো ধর্মীয় কিংবা দুনিয়াবী কল্যাণ দেখতে পেয়েছেন যা সম্পর্কে তুমি অবগত নও। এগুলো প্রকাশ করলে ক্ষতি হতে পারে।

[১৪২]. আল কুর'আন : আল মায়িদাহ, ৫/১০১।

এ আদবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মুরীদের সেই সব গোপন বিষয় যা পীরের জানা এবং যা পীরের কাছে গোপন রয়েছে। নিচের পংক্তিগুলো তাঁর হাল বর্ণনা করে:

'অনেক আন্তরিক ও মহৎ মানুষ আমার জানা,
যাদের গোপন বিষয় আমি অন্যদের থেকে করেছি আড়াল,
এসব যবে আমি রেখেছি আমা মাঝে লুকিয়ে,
প্রতিটি অন্তরেই রয়েছে মুক্ত একটি আঙ্গিনা,
যা এমনই রাজ্য যেখানে করা যায় ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা,
কাঙ্ক্ষিত নয় যার প্রকাশ ও প্রচারণা'।

চৌদ্দতম আদবের শর্ত এই যে, তুমি তোমার গোপন বিষয়গুলো তোমার পীরের কাছে প্রকাশ করবে। তা গোপন রাখার কোনো অনুমতি নেই। খোদা তা'আলার তরফ থেকে তোমার প্রতি যে পুরস্কার বর্ষিত হয়েছে তার সবই পরিষ্কার ভাষায় ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সহকারে পীরের কাছে ব্যক্ত করবে, যাতে করে তিনি এগুলো সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, তোমার সজ্ঞানে কোনো ব্যক্তিগত গোপন বিষয় তাঁর কাছে গোপন রাখা হলো; এটি হয়তো পরবর্তী পর্যায়ে অন্তরে জট সৃষ্টি করতে পারে যার দরুণ হয়তো তোমার শায়খের কাছ থেকে উপদেশ ও সাহায্যপ্রাপ্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। তুমি এটা শায়খের খেদমতে পেশ করলে জট অপসারিত হবে।

পনেরোতম আদব দাবি করে যে তোমার পীর (কিংবা তাঁর কাছ থেকে তোমার কাছে আগত কিছু) সম্পর্কে অন্য কাউকে কিছু বলতে হলে তার উপলব্ধি ক্ষমতার সাথে বিষয়টি সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এমন কোনো অস্পষ্ট কিংবা সূক্ষ্ম বিষয় তাকে বলো না যা সে বুঝতে অক্ষম। এটা তার জন্যে অর্থহীন, এমন কি ক্ষতিকরও হতে পারে। ওই ব্যক্তি হয়তো তোমার পীরের প্রতি বদ ধারণাও পোষণ করতে পারে।

মুরীদ এসব আদব পালন করলে খোদায়ী করুণার নূর (জ্যোতি/আলো) এবং তাঁর অফুরন্ত নেয়ামত (আশীর্বাদ) তোমার প্রতি অবতীর্ণ হবে; যার প্রতি তোমার লক্ষ্য ছিল তা তোমার যাহেরী (প্রকাশ্য) ও বাতেনী (অপ্রকাশ্য) সত্তায় প্রকাশ পাবে এবং তুমি খাস্ (বিশেষ) দলে নিজ স্থান করে নেবে। লক্ষ্য করো যে, ওপরে উদ্ধৃত ১৫টি আদব কেবলমাত্র

যথাযথ আচরণ উপলব্ধি করার জন্যেই, যাতে করে শিক্ষা দান ও তা গ্রহণ সংঘটিত হতে পারে। স্থান-কাল-পাত্রভেদে প্রতিটি সূফী তরীকা ও পীর মাশায়েখবৃন্দ এ সব আদবের সংস্কার সাধন করতে পারেন।

[মাহমুদ কাশানীর রচিত 'মিসবাহ্ আল হেদায়া ওয়া মিফতাহ্ আল কেফায়া'- "সঠিক পথের চেরাগ ও পর্যাপ্ত জ্ঞানের চাবিকাঠি" শীর্ষক পুস্তকের ১৫টি আদব অনুবাদ এখানে সমাপ্ত হলো)।

[এটি www.zahuri.org/article8.html শীর্ষক ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে]

[বার]

শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত

শায়খ আহমদ হেনড্রিকস্ (দক্ষিণ আফ্রিকা)

অনুবাদকের আ'রয

'দিগন্ত' স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল বন্ধ হওয়ার কিছু দিন আগে সরাসরি সম্প্রচারিত ওর এক অনুষ্ঠানে উপস্থাপককে ইমেইলযোগে প্রশ্ন করা হয় যে শরীয়ত ও তরীকত বলতে কী বোঝায় । ওতে উপস্থিত দুজন বক্তার একজন ছিলেন 'মুফতী' এবং অপরজন কোনো ইসলামী একাডেমীর 'অধ্যাপক'। 'মুফতী' সাহেব জবাবে বলেন যে শরীয়ত বলতে সামগ্রিকভাবে ইসলামী দ্বীনকে বোঝায় । 'অধ্যাপক' সাহেব তরীকত সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, এ বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন । কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআন মজীদে বিভিন্ন 'সাবিল' তথা পথ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। বলা বাহুল্য, এই নিষেধাজ্ঞা-সম্বলিত আয়াতগুলো আসলে মক্কার কাফেরদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল । 'অধ্যাপক' সাহেব কাফেরদের প্রতি অবতীর্ণ আয়াত মুসলমানদের প্রতি আরোপ করেন! বিশেষ করে আউলিয়ায়ে কেরাম ও বুযূর্গানে দ্বীনের প্রবর্তিত বিভিন্ন তরীকত সম্পর্কে তিনি কুৎসা রটনা করেন । আমরা মুসলমান সর্বসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই তাঁরা যেন তরীকত-বিষয়ক প্রশ্ন শরীয়ত ও তরীকতের জ্ঞান বিশারদদের কাছে উত্থাপন করেন এবং শুধু 'যাহেরী এলম' (প্রকাশ্য জ্ঞান)-সম্পন্ন কারো কাছে তা জানতে চেষ্টা না করেন । আমাদের মযহাবের ইমাম আবূ হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি সূফীদের ইমাম জা'ফর সাদেক রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর খেদমতে তাঁর জীবনের শেষ দুই বছর অতিবাহিত করেন । অতঃপর তিনি বলেন, "এই দুই বছর না হলে নু'মান বিন সাবেত (তিনি নিজে) 'হালাক' তথা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতেন।" দেখুন, ফেকাহর এতো বড় জ্ঞান বিশারদও তাসাউফ-তরীকতকে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং এ পথ ছাড়া নাজাত নেই বলে প্রত্যয় পোষণ করেছিলেন ।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিশিষ্ট আলেম শায়খ আহমদ হেনড্রিকস্ যিনি মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সনদপ্রাপ্ত এবং মক্কার বিখ্যাত আলেমে

দ্বীন শায়খ মুহাম্মদ আলাউইয়ী মালেকী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর ভাবশিষ্য, তিনি শরীয়তের দলিল-আদিল্লা থেকে এ প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন যে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অনুসৃত 'সাবিল' তথা তরীকত সত্য ও সঠিক । আমি এর অনুবাদ আমার পীর ও মুরশীদ চট্টগ্রাম আউলিয়াকুল শিরোমণি সৈয়দ মওলানা আলহাজ্ব এ, জেড, এম, সেহাবউদ্দীন খালেদ সাহেব কেবলা রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর পুণ্যস্মৃতিতে উৎসর্গ করছি ।

শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত

শরীয়ত, তরীকত ও হাকীকত- এই তিনটি সংজ্ঞার অর্থ এবং এগুলোর প্রয়োগ এমনই এক বিষয় যা নিয়ে কিছু বিতর্ক দেখা যায়। এগুলোর প্রকৃত অর্থ কী এবং এগুলো প্রথমাবস্থায় কেন অস্তিত্ব পেয়েছে তা-ও আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এই শব্দগুলোর প্রথমটি - শরীয়ত - আমাদের প্রায় সবার কাছেই সম্পূর্ণভাবে পরিচিত। আমরা যখন শরীয়ত সম্পর্কে কথা বলি, তখন মুসলমান সর্বসাধারণ বুঝতে পারেন যে আমরা হয় সার্বিকভাবে দ্বীন সম্পর্কে বলছি, নয়তো বিশেষ করে ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের আইনি দিকগুলো বা 'ফেকাহ' সম্পর্কে বলছি। সাধারণতঃ এর অভিব্যক্তি হলো, "আমাদেরকে শরীয়ত অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে।" আর আমরা সাথে সাথেই বুঝে যাই যে এর মানে "মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার আইন অনুযায়ী।" যে প্রশ্নটি মুসলমানদেরকে প্রায়শ-ই ভাবিয়ে তোলে তা হলো, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার আইনের পাশাপাশি সম্ভাব্য আর কী-ই বা থাকতে পারে? আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে আমাদের ধর্ম, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে আনীত জীবনাচার তথা শরীয়ত; এমতাবস্থায় আমরা যে শুনে থাকি তাসাউফের সাথে সম্পর্কিত তরীকত ও হাকীকত বিষয়ে, সেগুলো আসলে কী? আমরা এ প্রবন্ধে এ ব্যাপারে কিছু ব্যাখ্যা দেবার আশা রাখি, ইনশা'আল্লাহ।

আমি অন্য একটি লেখায় প্রমাণ করেছি যে তাফাককুর (গভীর ধ্যান) সচেতন ও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে নিবেদিত মুসলিম-জীবনের অপরিহার্য প্রারম্ভিক ধাপ। তাফাককুর ছাড়া আমাদের জীবন মুসলমান হিসেবে অসার হতে বাধ্য। আমাদের ইসলাম এ পরিস্থিতিতে কেবল নিজেদের পিতামাতাকে অনুকরণ করার চেয়ে বেশি কিছু হবে না; অথবা তা

মুসলমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার অনুকরণ ছাড়া ওর বাইরে কিংবা উর্ধ্বে যেতে পারবে না। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, তাফাককুর হতে পারে বৈপ্লবিক। এটি আমাদের জীবনে বৈপ্লবিক ও সামগ্রিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। তাফাককুরের বরকত ও নূর দ্বারা জীবনের অর্থ স্রেফ অনুকরণ ও অন্ধ বিশ্বাসের চেয়েও ঢের বেশি বলে পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের সাদামাটা, অগভীর, অনুকরণশীল ও বস্তুগত অস্তিত্বে আমরা সন্তুষ্ট হই না। এই অসন্তুষ্টি অহরহ-ই মানসিক যন্ত্রণা ও বিচলিত ভাবে পর্যবসিত হয়। আমরা মহাবিপদে পড়ি, যদি এই সময় কোনো নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় (সঠিক) পথপ্রদর্শন না পাই। সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমরা ধৈর্য ধরি এবং পরিণত ও জ্ঞানী পরামর্শকের শরণাপন্ন হই। আমাদের মনে রাখতে হবে, অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে তাফাককুরের প্রতি আমাদের উৎসাহ জোগানো হতে পারে, এমন কি তা চাপিয়েও দেয়া হতে পারে। হেদায়াতের পথ বহু ধরনের এবং তা কখনো কখনো রহস্যময়-ও। উদাহরণস্বরূপ, গভীর তাফাককুর কারো জীবনে কোনো সংকট থেকে উদ্ভূত হতে পারে - কোনো নিকটজনের মৃত্যু, বা চাকরি হারানো ও তৎপরবর্তী হতাশা, কিংবা কোনো বড় দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তির অঙ্গহানি ইত্যাদি দ্বারা।

'সংকটে পতিত' এই মুসলমানকে মহাপ্রভু আল্লাহ তা'আলা ডেকে বলেন, إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا অর্থাৎ, নিশ্চয় এই কুরআন এক উপদেশ; সুতরাং যার ইচ্ছে হয় সে যেন আপন প্রতিপালকের দিকে কোনো 'সাবিল' তথা রাস্তা গ্রহণ করে ।[১৪৩]

এই আয়াতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবৃত হয়েছে–

১. কুরআন মজীদ হলো একটি 'তাযকেরাহ'। এটি আমাদেরকে কতোগুলো মৌলিক সত্য বিষয় সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়; আর তা হলো আমরা কোত্থেকে এসেছি এবং সবশেষে কোথায় যাবো, যে সত্যটি সম্পর্কে আমরা বিস্মৃত। এটি এমন এক আলো যা আমাদেরকে বাস্তবতার প্রকৃতি সম্পর্কে, আমাদের নিজেদের সত্য (বাস্তবতা) সম্পর্কে এবং কবরের পরবর্তী জগত-বিষয়ে পুনঃজাগ্রত করে।

[১৪৩]. আল কুর'আন : আল মুযাম্মিল, ৭৩/১৯।

আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও ভাগ্যের দিকে এটি আহ্বান করে। আল্লাহ এরশাদ করেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ "আমি জ্বিন ও ইনসান জাতিকে আমার এবাদত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নি।"[১৪৪] সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আমার এবাদত' বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে 'আমাকে জানা'।

২. আল-কুরআনে যদি কোনো মুসলমানকে এ কথা-ই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তাঁকে এমন পথ গ্রহণ করতে দেয়া হোক যা তাঁকে মহান আল্লাহর সুগভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাগরে অবগাহন করতে দেবে এবং তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়তা করবে, আর চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার বেহেশত লাভের পথ সুগম করবে। তাঁকে এমন পথ বেছে নিতে দেয়া হোক যা তাঁকে তাঁর চূড়ান্ত পরিণতি তথা মহান আল্লাহর মা'রেফতের দিকে নিয়ে যাবে।

'সাবিল' বা পথ কিংবা সার্বিক কার্যক্রম, যেটি এই সুউচ্চ লক্ষ্যে কাউকে পৌঁছে দেয়, তাতে রয়েছে উলেমাদের মতানুযায়ী তিনটি পারস্পরিক-সম্পর্কিত বিষয়। আমরা সংক্ষেপে এগুলোর প্রতিটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো:

* মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উন্মোচিত সকল ঐশী আইন-কানুন, নৈতিকতা ও আকীদা-বিশ্বাসের সমষ্টিকে শরীয়ত বলে। তওহীদ (এ'তেকাদ), ফেকাহ (শাস্ত্রীয় আইন) ও তাসাউফ (সূফীতত্ত্ব/আধ্যাত্মিকতা)'র উলেমাবৃন্দ শরীয়তের উৎস আল-কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আইন-কানুন বের করার ও শরীয়তের সংকলনের গুরুদায়িত্ব কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে সুচারুভাবে পালন করেন।

* কোনো সুযোগ্য মোরশেদ/গুরু ও শিক্ষকের অধীনে শরীয়তের অনুশীলন। অনুশীলনের এই বিশেষ দিকটি হলো, বাহ্যিক ও আত্মিকভাবে হারাম তথা নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর বর্জন এবং সাধ্যানুযায়ী শরীয়তের আদেশগুলো পালন। এটিকেই 'তরীকত' বলা হয়।

[১৪৪]. আল কুর'আন : আয যারি'আত, ৫১/৫৩।

'তরীকাহ' শব্দটি, যার অর্থ 'পথ' বা 'পদ্ধতি', তা হচ্ছে শরীয়তের অনুশীলন। এই সংজ্ঞার অন্যান্য প্রয়োগগুলো সম্পর্কে আমার প্রবন্ধাবলীর এই সিরিজে পরে ব্যাখ্যা করা হবে, ইনশা'আল্লাহ। [এই সিরিজ ধাপে ধাপে অনুবাদ করার আশা রইলো, মওলার মর্জিতে - অনুবাদক]

* তৃতীয় দিকটি যাকে 'হাকীকত' বলা হয়, তা হলো জ্ঞানের ফল ও তার অব্যাহত অনুশীলন। 'হাকীকাহ' শরীয়ত ও তরীকতের ফল। যেমনটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি নিজ এলম তথা জ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাকে আল্লাহ পাক তিনি যা জানেন না তা-ও শিক্ষা দেবেন।"

পক্ষান্তরে, হাকীকতে উন্নতিরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বিদ্যমান:

* খোদার অন্বেষণকারী ও মহাপ্রভুর মধ্যকার পর্দা উঠে যাওয়ার পর্যায়, যার দরুন মহান আল্লাহর যাত (সত্তা) মোবারক ও তাঁর সিফাত (গুণাবলী), তাঁর রাজসিকতা ও সৌন্দর্য, আমাদের সন্নিকটে তাঁর অবস্থান ও পরম নৈকট্য অনুভব করা যায়। এই অনুভূতি ও কলব্ তথা অন্তরের জ্ঞানের ফলস্বরূপ খোদা-তালাশি ব্যক্তি তরীকতের গোপন রহস্য জানতে পারেন এবং তিনি হাকীকতেরও জ্যোতি ও অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করেন।

* নফস (কুপ্রবৃত্তি/একগুঁয়ে সত্তা) সব ধরনের দোষ-ত্রুটিমুক্ত হয়ে প্রশংসনীয় গুণাবলী লাভ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুপম আখলাক (চরিত্র-বৈশিষ্ট্য) এমতাবস্থায় খোদা-তালাশি ব্যক্তির নিজের আখলাক হয়ে যায়। তাঁর ধৈর্য, তওবা (পাপ মোচন), তাকওয়া (খোদাভীরুতা), এসতেকামাহ (নিয়মিত এবাদত-বন্দেগী), আল্লাহতে তাওয়াককুল (আস্থা ও নির্ভরতা) সবই গভীরভাবে প্রোথিত এবং প্রকৃত হয়ে থাকে।

* ওই খোদা-তালাশি ব্যক্তির অন্তর ইসলামের নূরের জন্যে অবশেষে উন্মুক্ত হয়। এবাদত ও নেক আমল অতি সহজেই তাঁর দ্বারা অর্জিত হয়। তিনি 'নফস আল-মোতমাইন্না' (প্রশান্ত সত্তা)-এর পর্যায়ে এখন

উন্নীত এবং তাঁর অস্তিত্বের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্বীনকে তিনি গ্রহণ করে নিয়েছেন।

অতএব, আমাদের কথার সার-সংক্ষেপ এই: শরীয়ত হলো জাহাজসদৃশ, যাতে আমরা চড়ি, তরীকত হলো সমুদ্র, আর হাকীকত হলো মণি-মুক্তা, যা আমরা সাগর থেকে আহরণ করি; অথবা, শরীয়ত গাছসদৃশ, তরীকত তার শাখা (ডালপালা) এবং হাকীকত সেই ফল যা আমরা ভক্ষণ করি।

ওপরে আমাদের উদ্ধৃত 'আপন প্রতিপালকের দিকে কোনো সাবিল (পথ)' আয়াতটিতে এই তিনটি বিষয়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আমাদের জীবনে শরীয়তের জ্ঞান, শরীয়তের অনুশীলন ও ফলশ্রুতিতে শরীয়ত-অনুশীলনের ফসল ঘরে তোলা, এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয় না করতে পারলে আমরা আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য অর্জন করতে সক্ষম হবো না। আমাদের অসন্তুষ্টি ও আত্মিক বিচ্ছিন্নতার সমাধান এই তিনের সমন্বয় সাধনে নিহিত। ধর্মের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে তুলে ধরার জন্যেই ইসলামী উলামাবৃন্দ শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত শব্দগুলো চয়ন করেছেন।

ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি হাকীকত ছাড়া শরীয়ত অনুশীলন করে, সে ফাসেক (পাপী); আর যে ব্যক্তি শরীয়ত বাদ দিয়ে হাকীকতের দাবি করে, সে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছে; কিন্তু যে ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন, তিনি ইসলামের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

সমাপ্ত

প্রমাণপঞ্জী

১/ মজমু'আ-এ-ফাতাওয়া-এ-ইবনে তাইমিয়া; ইবনে তাইমিয়া লিখিত ও দার আর-রাহমা, মিসর হতে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত; ১১ তম খণ্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।

২/ আল-মোখতাসার আল-ফাতাওয়া আল-মাসরিয়্যা; ইবনে তাইমিয়্যা রচিত ও আল-মাদানী প্রকাশনী কর্তৃক ১৯৮০ সালে প্রকাশিত; ৬০৩ পৃষ্ঠা।

৩/ প্রথমোক্ত রেফারেন্স বই; ৩১৪ পৃষ্ঠা।

৪/ এলম আস্ সুলূক (আল্লাহর রাস্তায় গমন সংক্রান্ত জ্ঞান); ১০ম খণ্ড মজমু'আ-এ-ফাতাওয়া-এ-ইবনে তাইমিয়া; ৫১৬ পৃষ্ঠা।

৫/ মজমু'আ-এ-ফাতাওয়া-এ-ইবনে তাইমিয়া; দার আর-রাহমাত, কায়রো; ২য় খণ্ড, 'তাসাউফ' পর্ব, ৪৯৭ পৃষ্ঠা।

৬/ প্রাগুক্ত ৫নং রেফারেন্স; ২য় পর্ব, ২য় খণ্ড, ৩৯৫-৩৯৭ পৃষ্ঠা।

Sufi-hearth Wednesday, 21 October 2015

অনুবাদকের পরিচিতি

নাম : কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন।

জন্ম তারিখ : ২০ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ইং।

পিতার নাম : মরহুম কাজী মুহাম্মদ মোশররফ হোসেন সি.এস. পি।

মাতার নাম : মরহুমা সালেহা নূরজাহান হোসেন।

আদি নিবাস : সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।

এস.এস.সি : ১৯৭৫ সাল, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল, ঢাকা।

এইচ.এস.সি : ১৯৭৭ সাল, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা।

বি.এ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখালেখির সাথে জড়িত ১৯৮১ সাল থেকে। প্রথম লেখাটি 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'য় ছাপা হয়। এছাড়া, চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত 'মাসিক তরজুমান' ও ঢাকা হতে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'সিরাজাম মুনীরা' পত্রিকায় নিয়মিত লেখা ছাপা হতো। ওহাবীদের প্রতি নসীহত মাসিক তরজুমানে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ ইং হতে ১৯৯২ ইং সাল পর্যন্ত সরকারি ও দাতা সংস্থাগুলোর দলিলপত্র অনুবাদকের পেশা হিসেবে নেয়ার পাশাপাশি বিখ্যাত ইসলামী গবেষক ও আলেম-উলামাবৃন্দের লেখা বইপত্র ও অনুবাদ করা হয়েছে অনেক। এদের মধ্যে আল্লামা হুসাইন হিলমী রহমতুল্লাহি আলাইহি ছাড়া ও শায়খ হিশাম কাব্বানী, শায়খ মুহাম্মদ আলুভী মালেকী, শায়খ নূহ হামীম কেবলা রহমতুল্লাহি আলাইহি'র অনুবাদ ও রয়েছে। ড. জিবরীল মুয়াদ হাদ্দাদ, ড. আব্দুল হাকীম মুরাদ প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনুবাদকের প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'হযরত মওলানা নূরুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি জীবনী ও কারামত', 'নব্য ফিতনা সালাফিয়্যা', 'সেমা (কাওয়ালী)', 'ওয়াহাবীদের সংশয় নিরসন', 'তাসাউফ সমগ্র', 'ঈদে মীলাদুন্নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] একটি প্রামাণ্য দলিল', 'ওহাবীদের প্রতি নসীহত', 'আহলে হাদিসের মতবাদের খণ্ডন', 'মাযহাব অমান্যকারীদের খণ্ডন' ইত্যাদি।